# স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৭ম বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা ❑ ডিসেম্বর ২০১৭-জানুয়ারি ২০১৮

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ডা. কুশল সেন

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা.অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা.আশীষ কুমার কুণ্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা.দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা.শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা.সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ মনোজ দে, গোপাল সরকার,
ডা. কুশল সেন,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯



## ডেঙ্গি নিয়ে জানার

অন্য ভাইরাল রোগের সঙ্গে সাধারণ ডেঙ্গির উপসর্গ-লক্ষণে খুব একটা ফারাক নেই—হঠাৎ করে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, মাথাব্যথা, গাঁটে ব্যথা। ডেঙ্গি ভাইরাসকে মারতে পারে এমন কোনো ওষুধ নেই। ডেঙ্গি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনা-আপনিই সারে, কিন্তু বিশেষ ধরনের ডেঙ্গিতে মানুষ মারা যেতে পারেন। রোগটির সম্পর্কে নানা কথা জানাচ্ছেন ডা. পুণ্যব্রত গুণ। ৫

## কোমরের ব্যথা ও পা বরাবর নামা ব্যথা

কোমরের ব্যথা বা 'লো ব্যাক পেইন' আর সায়াটিকা বা পা বরাবর ব্যথা নামা, এ-দুটো পরস্পর সম্পর্কিত। কী করে একে আটকানো যাবে, আর রোগ হলে কী করে তা কমিয়ে রাখা যাবে, সেটা জানলে খুব সুবিধা—লিখছেন ডা. মৃন্ময়। ১১

## বাঙালির যৌনতা ধারণা, ডাক্তারি ও ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট

যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে ওঠে, বিশেষ করে কৈশোরে। কিন্তু যৌনতা সম্পর্কে সুস্থ আলোচনা করে উত্তর, এ দেশে পাবার ব্যবস্থা নেই। ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর ওয়েবসাইট এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সহজ করে দেবার চেষ্টা করেছে। এদেশের সমস্যা মাথায় রেখে তার উত্তর খুঁজেছেন ডা. অপূর্ব। ১৮

## অনিতা: NEET, নয়া উদারনীতি, ডাক্তারি নৈতিকতা ও একটি মৃত্যু

দলিত দিনমজুরের মেয়ে অনিতা দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় অসাধারণ ফল করেও ডাক্তারিতে ভর্তি হতে পারল না। সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন করে অনিতা। সুপ্রিম কোর্ট তার কথা শুনলেন না। আত্মহত্যা করল অনিতা। অনিতাদের জন্য ডাক্তারিশিক্ষার দরজা বন্ধ হচ্ছে—লিখেছেন ডা. দেবাশিস হালদার। ৪৬

## চাই সবার জন্য স্বাস্থ্য

সমস্ত নাগরিককে বিনা মূল্যে, বৈষম্যহীনভাবে ও ক্রয়ক্ষমতা-নির্বিশেষে সর্বপ্রকার চিকিৎসা প্রদান করার জন্য সরকার যে স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলে, তাই হল ইউনিভার্সাল হেল্থ কেয়ার বা সর্বজনীন স্বাস্থ্য। সরকারি কমিটি দেখিয়েছে, ইচ্ছে থাকলেই সরকার এটা করতে পারেন—লিখেছেন ডা. কাঞ্চন মুখার্জি। ৫২


*স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

## সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | | ৩ |
| ডেঙ্গি নিয়ে জানার | ডা. পুণ্যব্রত গুণ | ৫ |
| ওবেসিটি বা মোটা হবার বিপদ | ডা. অপূর্ব | ৮ |
| কোমরের ব্যথা ও পা বরাবর নামা ব্যথা | ডা. মৃন্ময় | ১১ |
| জলবসন্ত | ডা. জয়ন্ত দাস | ১৫ |
| বাঙালির যৌনতা ধারণা, ডাক্তারি ও ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট | ডা. অপূর্ব | ১৮ |
| কিডনিতে জীবাণুসংক্রমণ বা পায়েলোনেফ্রাইটিস | ডা. পুণ্যব্রত গুণ | ২২ |
| কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন | | ২৫ |
| ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে | প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় | ২৭ |
| ডেন্টাল অ্যাবসেস বা দাঁতের 'ফোঁড়া' | ডা. কুশল সেন | ৩১ |
| বিরক্তিকর অ্যালার্জি | ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই | ৩৪ |
| এগোরাফোবিয়া | ডা. সুমিত দাশ | ৩৬ |
| মানসিক চাপ ও উদ্‌বেগ | রুমঝুম ভট্টাচার্য | ৩৭ |
| বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও তার প্রশিক্ষণ | স্বাতী মুখার্জী ঘোষাল | ৩৯ |
| অশোকনগরে কালাচ সাপ ও ফেসবুক গর্জন | দীপক চক্রবর্তী | ৪১ |
| অনিতা: NEET, নয়া উদারনীতি, ডাক্তারি নৈতিকতা ও একটি মৃত্যু | ডা. দেবাশিস হালদার | ৪৬ |
| নিরীহাসুরের "ইমার্জেন্সি" এক্সপিরিয়েন্স | ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত | ৪৯ |
| চাই সবার জন্য স্বাস্থ্য | ডা. কাঞ্চন মুখার্জি | ৫২ |
| চিকিৎসকদের ওপর হামলা | চিকিৎসকদের বক্তব্য | ৫৫ |



বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

# স্বাস্থ্যের বৃত্তে

**স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা**

### প্রাপ্তিস্থান

**কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল**

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

**কলকাতার অন্যত্র**

অমর কোলে স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা ৩২)

**কলকাতার বাইরে**

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভুম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ফোন ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

**শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।**

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

***স্বাস্থ্যের বৃত্তে***র গ্রাহক হোন।

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-

এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭

আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন

অথবা

NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে

Swasthyer Britto

A/c No. 0315101025024

Canara Bank, Princep Street Branch

IFSC Code: CNRB0000315

সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম-ঠিকানা, ফোন বা SMS করে জানান এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

# সম্পাদকীয়

নিয়মিত পাঠকরা এবারের *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাতায় একবার চোখ বুলিয়েই বুঝে যাবেন, অনেকগুলো লেখা নেওয়া হয়েছে ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর ওয়েবসাইট থেকে। সেগুলোর কেবল বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে, তা কিন্তু নয়। এদেশের উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে লেখাগুলো কিছুটা বদলানোও হয়েছে। আমাদের দেশের এক স্বাস্থ্যপত্রিকার অন্য এক দেশের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওয়েবসাইটের শরণাপন্ন হবার কারণ কী, সে প্রশ্নের জবাব দেবার দায় স্বীকার করে দু-চারটে কথা বলে ফেলা যাক।

বিগত কয়েক বছর ধরে ডাক্তাররা দেখছেন, এক ধরনের রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ঠাট্টা করে ডাক্তাররা বলেন, 'গুগল জেঠু' রোগী! মানে রোগীর প্রবণতা অনেকটা এইরকম। রোগটা নিয়ে ইন্টারনেট ঘেঁটে (মূলত গুগল সার্চ ইঞ্জিন দিয়ে যা যা পাওয়া যায় তার কয়েকটা পড়ে বা আধা-পড়ে)—"আমি জেনে গেছি কী কী করা দরকার, এখন ডাক্তারের একটা ওপিনিয়ন না নিলে ভালো দেখায় না, অতএব ওহে ডাক্তার বলে ফ্যালো দিকিনি . . .।"

সমস্যা হল, যেকোনো বিষয়ে একটু গভীরে পড়াশুনো না থাকলে, ইন্টারনেট থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর সম্ভাবনাই বেশি। গুগল বা ওরকম কোনো সার্চ ইঞ্জিন কিন্তু একটা ওয়েবসাইট কতটা সত্যি তথ্য দিচ্ছে সে ব্যাপারে কোনো খোঁজ রাখে না। বিশাল ওয়েবে যে-কেউ যেকোনো উদ্দেশ্যে তথ্য 'আপলোড' করলেই হল, গুগল সেটা আপনার সামনে এনে দেবে। ঝাড়াইবাছাই করার দায়িত্ব একান্তভাবেই আপনার। পদার্থবিজ্ঞান থেকে শরীরবিজ্ঞান, সব কিছুর জন্য এটা সত্যি। তবে ডাক্তারির ক্ষেত্রে সমস্যা বেশি, কেননা ট্রেনে বাসে চণ্ডীমণ্ডপে 'ডাক্তারি করা'-টা আমাদের সমাজে স্বীকৃত 'কালচার', ইন্টারনেট-গুগল তারই একটা প্রযুক্তি-দ্বারা-মান্যতাপ্রাপ্ত সংস্করণ।

ইংরেজদের নকলনবিশি করা আমাদের দেশে খুব চালু বটে, কিন্তু এই একটা ব্যাপারে আমরা সাহেবদের তোয়াক্কা করিনি। ব্রিটেনে প্রায় সর্বসম্মতভাবে বলে দেওয়া হয়, ডাক্তারিবিদ্যাটা যাঁরা রীতিমাফিক পড়ে আয়ত্ত করেননি, তাঁদেরও ডাক্তারি সম্পর্কে খানিকটা জানা খুব দরকার। কিন্তু সেই জানাটা নির্ভুল হতে হবে। তার দায়িত্ব সরকারই নিয়েছেন, ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে-এর মাধ্যমে। ওখানে অধিকাংশ মানুষই ইন্টারনেট দেখতে অভ্যস্ত, তাই সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায়, তাঁদের কতটা জানা দরকার সেটা নানাভাবে ঠিক করে, ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন। অপরপক্ষে, আমাদের দেশের মানুষের জন্য ঠিক কীভাবে কতটা তথ্য দিলে সবথেকে ভালো, সে ব্যাপারে কোনো সমীক্ষা নেই।

অবশ্য ব্রিটেনে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার সমান স্বাস্থ্য-পরিষেবা পাবার অধিকারের ব্যবস্থা সরকারই করেছে, সেটা এদেশে হয়নি। ফলে ওদেশে জনসাধারণকে অসুখ ও চিকিৎসা নিয়ে সরকারের তরফ থেকে জানানোর দায়িত্ব নেওয়া স্বাভাবিক। আমাদের দেশে সরকার দায় নেন না, সরকারি ব্যবস্থার উন্নতির বদলে ক্রমাবনতিই ঘটে, অথচ হাসপাতালের গায়ের রং আর ওপরের সাইনবোর্ড পালটিয়ে বোঝানো হয় জনগণের চিকিৎসা নিয়ে বিরাট কিছু করা হচ্ছে। ফলে রোগ নিয়ে সঠিক তথ্য দেবার কাজটা এইরকম কোনো সরকার, তা যে দলেরই হোক না কেন, আদৌ করতে চাইবে কিনা সে প্রশ্নও অবান্তর নয়। মানুষের ডেঙ্গি হলেও তাকে 'অজানা জ্বর' বলে সরকারের মুখরক্ষার মারপ্যাঁচ আর যাই হোক চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে যথার্থ তথ্য দেবার প্রবণতার সঙ্গে খাপ খায় না।

এমন অবস্থাতেই ব্রিটিশ ওয়েবসাইট থেকে তথ্য আমাদের কাজে লাগিয়েছি নেহাত বাধ্য হয়ে, যেখানে দরকার মনে হয়েছে সেখানে অল্পবিস্তর রদবদল করে।

# সংগ্রহ করুন

## স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি দরকারি সংকলন

লিখেছেন—

দিলীপ ঘোষ
কৌশিক দত্ত
সিদ্ধার্থ গুপ্ত
রেজাউল করিম
পুণ্যব্রত গুণ
গৌতম মিস্ত্রী
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়
অমিতাভ চক্রবর্তী
ইন্দ্রনীল ঘোষদস্তিদার
জয়ন্ত ভট্টাচার্য
স্থবির দাশগুপ্ত
ঈপ্সিতা পালভৌমিক
অরিন্দম বসু
ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস' ফোরাম

মূল্য ১২০ টাকা

# ডেঙ্গি নিয়ে জানার

দেড়শো বছর আগে ডেঙ্গি মহামারি এড়াতে বালক রবীন্দ্রনাথের পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছেড়ে পেনেটির বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজও তার ভয়ে মানুষ তটস্থ—লিখেছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

চলতি কথায় ডেঙ্গু বলা হলেও রোগটার আসল নাম ডেঙ্গি। অন্য ভাইরাল রোগের সঙ্গে সাধারণ ডেঙ্গির উপসর্গ-লক্ষণে খুব একটা ফারাক নেই—হঠাৎ করে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, মাথাব্যথা, গাঁটে ব্যথা। কয়েকদিন পর জ্বর সেরে যায়। অধিকাংশ সময় আমরা বুঝতে পারি না যে ডেঙ্গি হয়েছে। তাতে অবশ্য ক্ষতি নেই—কেননা ডেঙ্গি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আপনা-আপনিই সারে, ডেঙ্গি ভাইরাসকে মারতে পারে এমন কোনো ওষুধও নেই।

সমস্যা হল বিশেষ ধরনের ডেঙ্গি নিয়ে, যে ডেঙ্গিতে মানুষ মারা যান। খবরের কাগজ ও টিভিতে প্রচার ও রোগ-প্রতিরোধ ও রোগ-চিকিৎসার দায়দায়িত্ব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর চাপান-উতোরে আতঙ্ক বাড়ে।

ডেঙ্গি আমাদের দেশে নতুন নয়—হাড়-ভাঙা জ্বর বা হাড় মুড়মুড়ি ব্যারাম এই ডেঙ্গিই। কিন্তু গত ৩৫ বছর ধরে সারা পৃথিবীতেই ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ছে।

- ১৯৯৮-এ ৫৬টা দেশের ১২ লক্ষ মানুষ ডেঙ্গির এক মহামারিতে আক্রান্ত হন।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে প্রতি বছর প্রায় ৫০০ লক্ষ মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হন, যার মধ্যে ৫ লক্ষের হয় মারাত্মক রক্তক্ষরী ডেঙ্গি, এঁদের মধ্যে অন্তত ১২ হাজার মারা যান, যাঁদের অধিকাংশই শিশু।
- গত ১৫-২০ বছরে অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে—দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় শিশুদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ও মারা যাওয়ার কারণ হিসেবে এখন ডেঙ্গির স্থান, পেটের অসুখ ও শ্বাসনালী-ফুসফুসের হঠাৎ করে হওয়া তীব্র সংক্রমণের ঠিক পরেই।

## ডেঙ্গির রোগজীবাণু

এ রোগের জীবাণুর নাম ডেঙ্গি ভাইরাস। এই ভাইরাসের অন্তত চারটে ধরন রোগ ঘটায়।

## ডেঙ্গি জীবাণুর বাহক

ম্যালেরিয়ার পরজীবী বয়ে আনে যেমন অ্যানোফিলিস মশা, যেমন ফাইলেরিয়ার পরজীবীকে বহন করে কিউলেক্স মশা তেমনি ডেঙ্গির ভাইরাসকে বয়ে বেড়ায় ইডিস মশা। ছোট্ট, গায়ে ডোরা কাটা দাগ।

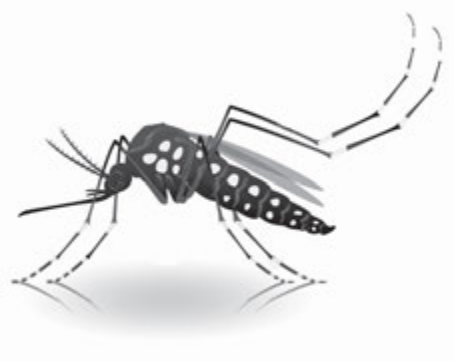

চিত্র ১. ডেঙ্গি মশা ইডিস ইজিপ্টাই

এই ডোরা কাটা দাগের জন্য এদের টাইগার মসকুইটোও বলা হয়।

মানুষের বসতি ও তার আশেপাশে জমে থাকা পরিষ্কার জলে ইডিস ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার আগে কেবল স্ত্রী মশাই রক্ত খাবার জন্য মানুষকে কামড়ায়। এরা কামড়ায় দিনের বেলায়। এরা খুব বেশি দূরে উড়তে পারে না, তাই থাকে বাড়ির আশেপাশেই।

ডেঙ্গি রোগীকে মশা কামড়ালে জীবাণু মশার পেটে চলে যায়। ৮-১০ দিন মশার পেটে বংশবৃদ্ধি করার পর সেই মশা কোনো সুস্থ মানুষকে কামড়ালে তার শরীরে ডেঙ্গির জীবাণু ঢোকে। জীবাণু ঢোকার ৩ থেকে ১০ দিন (সাধারণত ৫-৬ দিন) পর ডেঙ্গি রোগের উপসর্গ-লক্ষণ ফুটে ওঠে।

## ডেঙ্গির উপসর্গ-লক্ষণ

### সাধারণ ডেঙ্গি

হঠাৎ করে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, খুব মাথাব্যথা হয়, পেশি ও গাঁটে গাঁটে এমন ব্যথা হয় যে নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চোখের পেছনে ব্যথা দেখা দেয়, চোখ নাড়ালে ব্যথা হয়, চোখে চাপ দিলে ব্যথা বাড়ে, আলোর দিকে তাকাতে কষ্ট হয়। খুব দুর্বল লাগে, খিদে কমে যায়, পায়খানা কষে যায়, পেট কামড়ানো, কুঁচকিতে ব্যথা, গলা ব্যথা, অবসাদ ইত্যাদি হতে পারে। তাপমাত্রা সাধারণত ৩৯ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে। কয়েকদিন পর সাধারণত জ্বর ছেড়ে যায়, জ্বর থাকে না কয়েক ঘণ্টা থেকে ২ দিন অবধি। দ্বিতীয় বার জ্বর এসে থাকে ১-২ দিন। জ্বর না থাকার সময় বা দ্বিতীয় বার জ্বর হওয়ার সময়

প্রায় ৮০% রোগীর চামড়ায় ফুসকুড়ি বেরোয়। মোটামুটি ৫ দিনে ডেঙ্গি জ্বর ভালো হয়ে যায়, যদিও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগতে পারে। এ ধরনের ডেঙ্গিতে মৃত্যুর হার খুব কম।

### রক্তক্ষরী ডেঙ্গি

হঠাৎ করে খুব বেশি জ্বর হয় (৪০ থেকে ৪১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড), মুখ লালচে দেখায়, মাথাব্যথা থাকে। খিদে কমে যায়, বমি হয়, ডান দিকের পাঁজরের নীচে টিপলে ব্যথা লাগে বা পুরো পেটে ব্যথা হয়।

চিত্র ২. ডেঙ্গি জ্বরে র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি

এই ধরনের ডেঙ্গির গুরুতর অবস্থায় ছোটো বাচ্চাদের খিঁচুনি হতে পারে। শরীরে অণুচক্রিকার সংখ্যা খুব কমে গিয়ে নানা জায়গা থেকে রক্তপাত হতে পারে—চামড়ার ওপর লাল লাল ফুটকি, আপনা থেকে কালশিটে পড়ে যাওয়া, নাক দিয়ে ও মাড়ী দিয়ে রক্তপাত, কালো পায়খানা, রক্তবমি ইত্যাদি হতে পারে। যদি একসঙ্গে একাধিক ধরনের ভাইরাস দিয়ে সংক্রমণ হয় তাহলেই রক্তক্ষরী ডেঙ্গি (Dengue Hemorrhagic Fever) হয়।

### ডেঙ্গি থেকে শক

শরীরের রক্তজালিকা বা ক্যাপিলারির দেওয়াল থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে। ফলে রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে রোগী অচেতন হয়ে পড়েন। নাড়ি বা পালস দুর্বল ও দ্রুত হয়, রক্তচাপ কমে যায়, চামড়া ঠান্ডা হয়ে যায়। ডেঙ্গি থেকে শক (Dengue Shock Syndrome)-এ খুব দ্রুত চিকিৎসা না করলে মৃত্যু প্রায় অবধারিত। তবে রক্তক্ষরী ডেঙ্গি বা ডেঙ্গি থেকে শক খুবই অল্পসংখ্যক রোগীর হয়, এই যা বাঁচোয়া।

## ডেঙ্গির জন্য ল্যাবরেটরি পরীক্ষা

ডেঙ্গি হয়েছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জনে কয়েক ধরনের পরীক্ষা করা যায়—

১. রক্তে ডেঙ্গি ভাইরাস আছে কিনা দেখা—এতে রোগের উপস্থিতি সবচেয়ে নিশ্চিত করে বলা গেলেও এই পরীক্ষায় যন্ত্রপাতি ও দক্ষ কর্মী লাগে বেশি।

২. রক্তরসে ডেঙ্গি ভাইরাস-বিরোধী অ্যান্টিবডির মাত্রা বাড়ছে কিনা দেখা—এই পরীক্ষাগুলো সহজ, সময়ও কম লাগে। কিন্তু ডেঙ্গি ও অন্য এই জাতীয় ভাইরাসের মধ্যে সাদৃশ্যের জন্যে ফলস পজিটিভ ফলাফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (অর্থাৎ পরীক্ষার ফল বলছে ডেঙ্গি হয়েছে, কিন্তু আসলে ডেঙ্গি হয়নি)। অন্যদিকে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে ৪-৬ দিন সময় লাগে, তাই রোগের প্রথমাবস্থায় ফলস নেগেটিভ ফলাফল আসে।

৩. রক্তে ডেঙ্গি অ্যান্টিজেন নির্ণয়ের পরীক্ষা NS-1 অ্যান্টিজেন—সংক্রমণের ১ থেকে ৯ দিন অবধি এই পরীক্ষায় ফল পাওয়া যায়। তবে অন্য ভাইরাল জ্বরে ফলস পজিটিভ ফলও পাওয়া যেতে পারে।

৪. এছাড়া রোগীর মৃত্যুর পর তার কলা (টিস্যু)-র ইমিউনো-হিস্টোকেমিস্ট্রি পরীক্ষা, রোগীর রক্তরস বা কলার পলিমারেজ চেন রিঅ্যাকশন (পিসিআর) পরীক্ষা করে ভাইরাসের আরএনএ দেখা—এসব রোগ-নির্ণয়ের নতুন পরীক্ষা।

**ডেঙ্গির প্রতিরোধ বলুন বা চিকিৎসা—সরকার, পুরসভা বা পঞ্চায়েত উদ্যোগী না হলে কোনোটাই সম্ভব নয়।**

৫. রোগটাকে নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করা ছাড়া এই পরীক্ষাগুলোর কোনো গুরুত্ব কিন্তু রোগ-চিকিৎসায় নেই। গুরুত্বপূর্ণ হল রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা মাপা। অণুচক্রিকা কমে যাওয়া ডেঙ্গির এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। সাধারণত প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা ১ লাখের নীচে নেমে আসে। ২০ হাজারের নীচে নামলে আপনা থেকেই রক্তপাত হতে পারে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল রক্তের পিসিভি (প্যাকড সেল ভল্যুম) মাপা। রক্তের জলীয় অংশ কমলে পিসিভি বাড়ে।

## ডেঙ্গির চিকিৎসা

- এই রোগের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই, সাধারণ ডেঙ্গিতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ারও কোনো দরকার নেই।
- জ্বর কমানোর জন্য শরীরে জলপট্টি বা বরফ দেওয়া যায়। এছাড়া ব্যথা ও জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল খাওয়া যায়।
- অ্যাস্পিরিন, আইবুপ্রোফেন, ডিক্লোফেনাক আদি অন্যান্য জ্বর-বেদনানাশক দেওয়া যাবে না, কেননা এগুলোতে রক্ত-ক্ষরণের প্রবণতা বাড়ে। তাছাড়া ভাইরাসজনিত জ্বরে বাচ্চাদের অ্যাস্পিরিন খেতে দিলে রে'জ সিনড্রোম নামক জটিলতার জন্য মৃত্যুও হতে পারে।
- শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্য জলসহ অন্যান্য তরল প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে। খুব বেশি ঘাম, পাতলা পায়খানা বা বমি হতে থাকলে নুন-চিনির শরবত বেশি করে দিতে হবে।

➢ রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা খুব কমে গেলে বা নিজে থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকলে পুরো রক্ত বা অণুচক্রিকা দিতে হবে অবস্থার গুরুত্ব বুঝে।

➢ ডেঙ্গি থেকে শক হলে হাসপাতালে ভর্তি করে শিরায় বিভিন্ন তরল দিতে হবে।

➢ ডেঙ্গিতে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো ভূমিকা নেই।

## ডেঙ্গি একটা সামাজিক রোগ

অন্যান্য সংক্রামক রোগের মতো ডেঙ্গি সংক্রমণ ও মহামারি হয়ে ওঠার পিছনে আছে সামাজিক কারণ। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, কাজের খোঁজে

ভিয়েতনাম মানুষকে ডেঙ্গি থেকে বাঁচাতে এক অভিনব রণনীতি তৈরি করে। বড়ো জলাশয়গুলোতে এক ধরনের শামুক ছাড়া হয় যারা ইডিস মশার লার্ভা খেয়ে ফেলে। জনশিক্ষা ও পরিত্যক্ত পাত্র (যাতে জল জমতে পারে) নষ্ট করে ফেলার মতো কাজও এই কর্মসূচির অন্তর্গত।

মানুষের গ্রাম থেকে শহরে চলে আসা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে বাধ্য হওয়া, বিভিন্ন কাজে মানুষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আসা-যাওয়া বেড়ে যাওয়া হল ডেঙ্গি রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ। আরেকটা বড়ো কারণ হল রোগ-জীবাণুবাহী কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি কর্মসূচিতে ঢিলে পড়া।

## ডেঙ্গি হওয়া ঠেকাতে

☞ ডেঙ্গির কোনো কার্যকরী টিকা এখনও বেরোয়নি।

☞ কিছু কিছু ভাইরাসজনিত রোগ একবার হলে আর হয় না, কেননা শরীর ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ডেঙ্গির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেরকম নয়, কেননা চার রকম ডেঙ্গি ভাইরাস দিয়ে ডেঙ্গি হয়। তাই কোনো নির্দিষ্ট ধরনের ভাইরাস দিয়ে একবার ডেঙ্গি হলে সেই ভাইরাস দিয়ে আর ডেঙ্গি হবে না কিন্তু অন্য রকম ভাইরাস দিয়ে ডেঙ্গি হতেই পারে।

☞ মশারি ব্যবহার করে ডেঙ্গির হাত থেকে পুরো বাঁচা যায় না কেননা এ মশা কামড়ায় দিনের বেলায়। লম্বা হাতা জামা-প্যান্ট পরে কামড় থেকে কিছুটা বাঁচা যায়, কিন্তু গরমের দেশে তেমনটা কতটা সম্ভব?

☞ ডেঙ্গি প্রতিরোধের আসল উপায় হল ইডিস মশার বংশ-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা। পরিষ্কার জল জমতে না দিলে ইডিস মশা ডিম পাড়তে পারবে না। পূর্ণবয়স্ক মশাদের মারার জন্য বিভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার করা যায়, তবে এই কীটনাশকগুলোর মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ওপর বিষক্রিয়া আছে। কিছু ছোটো মাছও মশার লার্ভা খেয়ে ফেলে মশার বংশবৃদ্ধি আটকায়।

ভিয়েতনাম তার ১২ টা রাজ্যের ৩ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষকে ডেঙ্গি থেকে বাঁচাতে এক অভিনব রণনীতি তৈরি করে। বড়ো জলাশয়গুলোতে এক ধরনের শামুক ছাড়া হয় যারা ইডিস মশার লার্ভা খেয়ে ফেলে। জনশিক্ষা ও পরিত্যক্ত পাত্র (যাতে জল জমতে পারে) নষ্ট করে ফেলার মতো কাজও এই কর্মসূচির অন্তর্গত। ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ অবধি সাফল্যের সঙ্গে এই রণনীতি কার্যকর করা হয়। ২০০২ থেকে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় ডেঙ্গি জ্বরের একজন রোগীও ধরা পড়েননি।

ডেঙ্গির প্রতিরোধ বলুন বা চিকিৎসা—সরকার, পুরসভা বা পঞ্চায়েত উদ্যোগী না হলে কোনোটাই সম্ভব নয়। আমাদের দেশের সরকার কবে ডেঙ্গি বা অন্য সংক্রামক রোগের মহামারি থেকে নাগরিকদের বাঁচাতে উদ্যোগী হবে? স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকার সম্পাদক ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনে বহুদিনকার কর্মী।

একক মাত্রা Advt.
গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা: ১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ: ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ: ৯৮৩০২৩৬০৭৬/৯৮৩০৪৯৩২৩৯

# ওবেসিটি বা মোটা হবার বিপদ

"মোটকা মানুষ হোতকা মুখ
বুদ্ধি মোটা আহাম্মুক . . .
মস্ত মোটা মানুষ যত
আস্ত কোলা ব্যাঙএর মতো
নিষ্কর্মা সব হদ্দ কুড়ে
কুমড়ো গড়ায় রাস্তা জুড়ে . . ."

কে না জানে ছড়াটা সত্যি নয়! আজকাল একটা কথা খুব চালু হয়েছে, বডি শেমিং (Body Shaming)—মানে হল কারও শরীর নিয়ে খোঁটা দেওয়া। সেটা অত্যন্ত কুরুচিকর ব্যাপার বলেই ধরা হয়। এই ছড়াটা হল মোটা মানুষকে তার মোটা হওয়া বা স্থূলত্ব নিয়ে গালিগালাজ করার বা বডি শেমিং-এর আদর্শ উদাহরণ। তা বলে কী আর মোটা হওয়া ভালো জিনিস? তা নয়। ডাক্তার বলবেন, আপনার শরীর সুন্দর না অসুন্দর সেটা গায়ে পড়ে বলার অধিকার কারও নেই। কিন্তু মোটা হলে আপনারই বিপদ। মোটা হওয়া বা ওবেসিটি নিয়ে ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর লেখা অনুসরণে বাংলায় এটি লেখা হয়েছে।

আমরা আজ মোটা হওয়া, মোটা হওয়ার বিপদ, ও মোটা থেকে রোগা হওয়ার ১০১টি সহজ উপায় নিয়ে আলোচনা করব। তা কাউকে মোটা বললেই তো আর সে মোটা হয়ে যায় না, যদি না মেপেজুপে তাকে দেখানো যায়। তো আমরা প্রথমেই দেখে নেব কাউকে কখন সায়েন্টিফিকালি মোটা বলা যাবে—

কোনো মানুষের ওজন স্বাস্থ্যসম্মত কিনা তা মাপার বেশ কিছু উপায় রয়েছে, তবে সেগুলির মধ্যে বডি মাস ইন্ডেক্স বা দেহভর সূচক বা BMI-এর পরিমাপই সবথেকে বেশি ব্যবহার করা হয়। BMI থেকে জানা যায় কোনো মানুষের ওজন তার উচ্চতার পক্ষে স্বাস্থ্যসম্মত কিনা। BMI পরিমাপ করতে কোনো আলাদা যন্ত্র লাগে না।

BMI মাপা যায় এই ফর্মুলা থেকে:

BMI = দৈহিক ওজন (কেজিতে) ÷ দৈহিক উচ্চতা$^2$ (মিটারে)

BMI 18.5 - 24.9 > স্বাভাবিক ওজন

25 - 29.9 > মাত্রাধিক ওজন (Overweight)

30 - 39.9 > স্থূল (Obese)

> 40 = অত্যধিক স্থূল (Severely obese)

অবশ্য BMI থেকে সবসময় সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না। যেমন পেশিবহুল ব্যক্তির ক্ষেত্রে শরীরে চর্বি বেশি না থাকা সত্ত্বেও পেশির ওজন বেশি হওয়ার কারণে BMI বেশি হতে পারে। এক্ষেত্রে কিন্তু ওই ব্যক্তিকে স্থূল বা মাত্রাধিক ওজনের বলা যায় না। এসব ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি সেটা হল কোমরের পরিধি বা Waist Circumference। সাধারণত BMI বেশির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের ক্ষেত্রে কোমরের পরিধি ৯৪ সেমি (৩৭ ইঞ্চি)-র বেশি আর মেয়েদের ক্ষেত্রে কোমরের পরিধি ৮০ সেমি (৩১.৫ ইঞ্চি)-র বেশি হলে তাদের মোটা বলা হয়।

BMI-এর এই হিসেব জাতিগত পার্থক্যের সঙ্গে কিছুটা কম বেশি হয়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মান এই পরিমাপগুলির থেকে কিছুটা কম ধরা উচিত। তাই ICMR মাত্রাধিক ওজনের নিম্নতম BMI মান ২৩ স্থির করেছে। অর্থাৎ আমাদের দেশের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক BMI ১৮.৫ থেকে ২২.৯ ধরা হয়।

বাচ্চাদের জন্যে এই হিসেব প্রযোজ্য নয়।

## মোটা হওয়ার বিপদ

মোটা হলে দেখতে বেঢপ লাগে কি লাগে না, সেটা নিয়ে আমাদের কথা বলার কারণ নেই। কিন্তু অনেকরকম শারীরিক অসুবিধা ও রোগ সৃষ্টি হয়, যার অনেকগুলিই এক্ষুনি খুব কষ্ট না দিলেও দীর্ঘমেয়াদি মারণ রোগের আকার নিতে পারে। যেমন:

১. **টাইপ 2 ডায়াবেটিস**—মোটা হলে শরীরে ইনসুলিনের কাজ বাধা পায়, যাকে আমরা বলি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। এর ফলে শরীরে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ডায়াবেটিস হতে পারে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে চোখ, কিডনি, হার্ট ইত্যাদি অমূল্য প্রত্যঙ্গের স্থায়ী ক্ষতি হয়।

২. **করোনারি হার্ট ডিজিস**—মোটা মানুষদের রক্তে চর্বি ও কোলেস্টেরলের পরিমাণ অনেক বেশি থাকতে পারে, যা কিনা হার্টের নিজের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবাহে জমে গিয়ে স্থায়ী হার্টের অসুখ বা হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

৩. বেশ কিছু ধরনের **ক্যান্সার** যেমন **স্তন ক্যান্সার, বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার** ইত্যাদির সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত ওজনের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে।

৪. মোটা মানুষদের **স্ট্রোক** বা **মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ** হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

৫. মোটা মানুষদের হাঁটু, কোমর ইত্যাদি অস্থিসন্ধির ওপর চাপ বেশি পড়ে, তাই এরা **কোমর হাঁটুর ব্যথা, অস্টিওআর্থ্রাইটিসে** ভোগেন বেশি।

৬. এছাড়াও মাত্রাধিক ওজন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বিভিন্ন হরমোনের স্বাভাবিক মাত্রার হেরফের ঘটে। **বন্ধ্যাত্বও** দেখা দিতে পারে।

৭. স্থূলতার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু **মানসিক রোগও** জড়িয়ে, যার মধ্যে **অবসাদ, খাওয়ার অসুখ (Eating Disorder, Bullimia Nervosa), ঘুমের অসুখ (Sleep Disorder)** উল্লেখযোগ্য।

৮. গর্ভাবস্থায় মোটা মানুষদের **গর্ভাবস্থাকালীন ডায়াবেটিস, প্রিএক্লাম্পসিয়া** (উচ্চ রক্তচাপ ও পেচ্ছাবে প্রোটিন বেরিয়ে যাওয়ার অসুখ) বেশি হয়।

৯. এছাড়া মোটা মানুষদের **শ্বাসকষ্ট, নাকডাকা, ঘাম বেশি হওয়া, সহজেই ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, সমস্ত কাজে উৎসাহের অভাব** ইত্যাদি বেশি দেখা যায়।

## মোটা হওয়ার কারণ কী?

সাধারণভাবে প্রয়োজনের থেকে বেশি পরিমাণে ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) জাতীয় খাবার খেলে তার অতিরিক্ত অংশ আমাদের কাজে লাগে না, সেটা চর্বি হিসাবে সঞ্চিত হতে থাকে। শরীরে স্বাভাবিক পরিমাণ সঞ্চিত চর্বি শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, অভুক্ত থাকাকালীন প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দেয়। কিন্তু চর্বি সঞ্চয়ের পরিমাণ বেড়ে গেলে মানুষ মোটা হয়।

এছাড়া বেশ কিছু রোগে যেমন থাইরয়েড গ্রন্থির কম ক্ষরণজনিত রোগ (Hypothyroidism), কুশিং সিন্ড্রোম ও বেশ কিছু ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় শরীরে চর্বি জমতে পারে, যার মধ্যে স্টেরয়েড-এর নামটা সবাই জানেন। এছাড়া মানসিক অবসাদ, মৃগী রোগ ও সিজোফ্রেনিয়ার ওষুধ উল্লেখযোগ্য।

বিরল কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ কিছু জিন মোটা হওয়ার বৈশিষ্ট্য বংশান্তরে বহন করে।

ধূমপায়ীরা ধূমপান ছাড়লে শরীরের ওজন বাড়ে, যদিও সেটা স্বাস্থ্যকর।

## মোটা হওয়ার সঙ্গে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের কী সম্পর্ক?

সোজা করে বলতে গেলে বেশি খাওয়া ও সেই তুলনায় কম পরিশ্রম করার কারণে শরীরে চর্বি জমে। ফ্যাট ও শর্করা জাতীয় খাবারের মাধ্যমে অতিরিক্ত পরিমাণ ক্যালোরির খাবার রোজ খেতে থাকলে এবং তার সঙ্গে ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ঘটলে ওই অতিরিক্ত ক্যালোরি শরীরে চর্বির আকারে জমা হয়।

খাবার থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তার পরিমাপ করা হয় ক্যালোরি দিয়ে। মোটামুটি পরিশ্রমী একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দৈনিক ক্যালোরি চাহিদা ২৫০০ কিলোক্যালোরি আর মহিলাদের ক্ষেত্রে ২০০০ কিলোক্যালোরি। আমাদের দেশে এর থেকেও কিছুটা কম ধরা উচিত। শুনে মনে হতে পারে এত কিলোক্যালোরির খাবার তো অনেক অনেক খাবার! কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। বেশ কিছু খাবার আছে যেগুলির খুব কম পরিমাণ খেলেও প্রচুর ক্যালোরি শরীরে ঢুকে যায়। যেমন আপনি এক প্লেট চিকেন টিক্কা মশালা আর দু-খানা বাটার নান, আর এক বোতল কোকাকোলা খেলেন তাতেই প্রায় ১৮০০ কিলোক্যালোরি হয়ে যাবে!

## কী কী খাবার খেলে চর্বি বেশি জমে?

সমস্ত রকম খাবার খেলেই চর্বি জমতে পারে, তবে বিশেষ কিছু খাবারে চর্বি বেশি জমে যেমন,

১. প্রক্রিয়াজাত বড়োদের ও শিশুদের খাবার, ফাস্টফুড, চিপস।

২. মদ্যপান—মদে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি থাকে, মদ্যপায়ীরা অনেকক্ষেত্রেই মোটা হন। এদের লিভারেও ফ্যাট জমতে পারে।

৩. নিয়মিত রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া করা—সুপ, স্টার্টার, মেন কোর্স, ডেসার্ট ইত্যাদি হরেক কিসিমের খাবার আমরা রেস্টুরেন্টে গেলে খাই, যা আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যালোরি চাহিদার থেকে অনেক বেশি।

৪. অত্যধিক পরিমাণে প্রক্রিয়াজাত ফলের রস (বোতলে বা ক্যানে যা বহুদিন রাখা যায়), মিষ্টি পানীয় (Sweetened Beverages)—যার মধ্যে পেপসি, কোকাকোলাও পড়ে।

৫. অনেক সময় মানসিক অবসাদে ভুগলে মানুষ বেশি পরিমাণে খান। তাছাড়া খাওয়া-ঘটিত মানসিক রোগ (Eating Disorder) যেমন বুলিমিয়া নার্ভোসা, Binge Eating Disorder, Obsessive Compulsive Disorder ইত্যাদিতে শরীরে চর্বি জমতে পারে।

## মেদ কমানোর উপায় কী?

১. পরিমিত ক্যালোরিসম্পন্ন খাবার খান। কী খাবেন নিজে বুঝতে না পারলে ডাক্তার, ডায়েটিশিয়ানকে বলুন।

২. নিয়মিত পরিশ্রম ও খেলাধুলো করুন।

৩. ফাস্ট ফুড ও জাংক ফুড খাওয়ার অভ্যাস ছাড়ুন।

৪. বেশি খেতেই হবে এমন পরিস্থিতি (যেমন বিয়েবাড়ি, অফিসের পিকনিক) এড়িয়ে চলুন।

৫. মদ্যপান কমান ও আস্তে আস্তে বন্ধ করুন।

## দৈনন্দিন কতক্ষণ শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত?

পাহাড়ি অঞ্চলে পেটমোটা লোক খুব কম দেখা যায়। শহরের চাইতে গ্রামাঞ্চলে মোটা লোক কম পাওয়া যায়। তার একটাই কারণ। বেশি পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম। শহরের মানুষ তো কাঠ কাটতে পারবেন না, মাটি কোপাতেও পারবেন না, সাইকেল চালানোর জায়গা নেই। তাই প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট অ্যারোবিক ব্যায়াম করুন বা ঘাম ঝরিয়ে হাঁটুন, পারলে সাইকেল চালান, সাঁতার কাটুন।

## মেদ কমতে কতদিন সময় লাগবে?

মেদ একদিনে জমে না। একদিনে কমবেও না। দীর্ঘদিন পরিমিত খাদ্যগ্রহণ ও যথেষ্ট পরিশ্রম করা ছাড়া আর কোনো সহজ উপায় নেই। "বিনা এক্সারসাইজে ৭ দিনে ১০ কেজি ওজন কমানোর সাইডএফেক্ট ছাড়া আধুনিক পদ্ধতির" আশ্রয় নিয়ে শরীরটা জলাঞ্জলি দেবেন না।

## রোগা হওয়ার কী কোনো ওষুধ আছে?

অর্লিস্ট্যাট জাতীয় কিছু কিছু ওষুধ আছে যেগুলি শরীরে ফ্যাটের শোষণ কমায়, কিন্তু অতিরিক্ত ফ্যাট পায়খানার সঙ্গে বেরোনো ও অন্ত্রের ব্যাকটিরিয়া দ্বারা ওই ফ্যাটের আংশিক জারণের ফলে প্রচুর গ্যাস তৈরি হয় ফলে শারীরিক অস্বস্তির পাশাপাশি অন্ত্রের ব্যাকটিরিয়া পপুলেশনের স্থায়ী পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন ঘটে।

## চর্বি কমানোর অপারেশন বা লাইপোসাকশন কী?

শরীরের কোনো জায়গায় চর্বি জমে গেলে সেই চর্বি টেনে বের করে দেবার অপারেশন হল লাইপোসাকশন। সাধারণত পেটে জমা চর্বিতে এটা করা হয়। খুব মোটা দাগে বলতে গেলে, চর্বির মধ্যে বিশেষ সিরিঞ্জ আর সুচ দিয়ে জলীয় দ্রবণে গুলে সেটা আবার মোটা সুচ দিয়ে টেনে বের করা হয়।

## ওজন কমানোর অপারেশন বা ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি কী?

ওজন কমানোর অপারেশন বা ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি করা হয় তাদের,

১. যাদের BMI ৪০-এর বেশি

২. যাদের BMI ৩৫ থেকে ৪০-এর মধ্যে হলেও একইসঙ্গে ডায়াবেটিস বা উচ্চরক্তচাপ আছে।

৩. যারা অপারেশনের পরেও নিয়মিত ফলো আপ করাবেন, খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করবেন ও নিয়মিত এক্সারসাইজ করবেন।

ব্যারিয়াট্রিক সার্জারিতে পাকস্থলীতে একটি নিষ্ক্রিয় ব্যান্ড রেখে দেওয়া যেতে পারে (যাতে গৃহীত খাদ্যের পরিমাণ কম হয়), পাকস্থলী ও অন্ত্রের বাইপাস করে দেওয়া যেতে পারে, বা পাকস্থলীর কিছুটা অংশ কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

এই অপারেশনগুলি ওজন কমায় বটে, কিন্তু খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন না করলে, নিয়মিত এক্সারসাইজ না করলে অনেকসময়ই যথেষ্ট ফল পাওয়া যায় না বা ওজন পরে আরও বাড়তে থাকে। এছাড়া এসব অপারেশনের ঝুঁকিও খুব কম নয়। অপারেশনের পর শরীরের অতিরিক্ত চামড়া ঝুলে পড়তে পারে, শরীরে ভিটামিন ও মিনারেলস শোষণ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।

## শেষ কথা

মোটা হওয়া আর মোটা হওয়ার বিপদ নিয়ে লিখলাম। পাঠক কি এখনও মোটা থেকে রোগা হওয়ার ১০১টি সহজ উপায় খুঁজছেন? না, অতগুলো উপায় নেই, পরিমিত ক্যালোরিসম্পন্ন খাবার খান, আর নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করুন। তাতেও ওজন না কমলে ডাক্তার দেখান, হয়তো আপনার হাইপোথাইরয়েড বা ওরকম কোনো রোগ আছে। শেষ উপায় হল লাইপোসাকশন আর ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি। সেই অবধি না পৌঁছোনোই ভালো। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর লেখা অনুসরণে বর্তমান লেখাটি বাংলায় লিখেছেন ডা. অপূর্ব, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

# কোমরের ব্যথা ও পা বরাবর নামা ব্যথা

ডা. মৃন্ময়

ডাক্তারি পাশ করার পর কাজের সূত্রে যে অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত থেকেছি সেই জায়গাগুলিতে শ্রমিক শ্রেণির এক বড়ো অংশ জুট মিল ও জরি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে জরির কাজে পুরুষ ও মহিলা প্রায় সমানভাবে যুক্ত। এই কাজে বেশির ভাগ সময় প্রায় গড়ে ১৪-১৮ ঘণ্টা একইভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে কাজ করতে হয়। ফলে অল্প বয়স থেকেই প্রায় সবাই কম বেশি কোমর ও ঘাড়ের ব্যথায় ভোগেন। বয়স বাড়লে তার ওপর হাড়ের স্পন্ডাইলসিস বা ক্ষয়জনিত রোগের থাবায় জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কাজের অঞ্চলের কারণে যে কয়েকটি রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে বেশ হিমশিম খেতে হয়েছে তার মধ্যে কোমরের ব্যথা ও সঙ্গে পা বরাবর ব্যথা অন্যতম। কোমরের ব্যথা ও পা বরাবর নামা ব্যথা দুটো আলাদা রোগ হলেও বেশিরভাগ সময় দুটোই একসঙ্গে দেখা যায়। তাছাড়া কারণ ও চিকিৎসা পদ্ধতির দিক থেকে রোগ দুটো এতটাই কাছাকাছি ও পরিপূরক যে একসঙ্গেই দু-টির আলোচনা সেরে নেওয়া যায়।

বেশিরভাগ কোমরের ব্যথা ও পা বরাবর ব্যথা কোনো চিকিৎসা ছাড়াই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিজের থেকে ঠিক হয়ে যায়। যদি ব্যথা তিন মাস পরেও থাকে তখন তাকে দীর্ঘস্থায়ী বলে ধরা হয়। এই

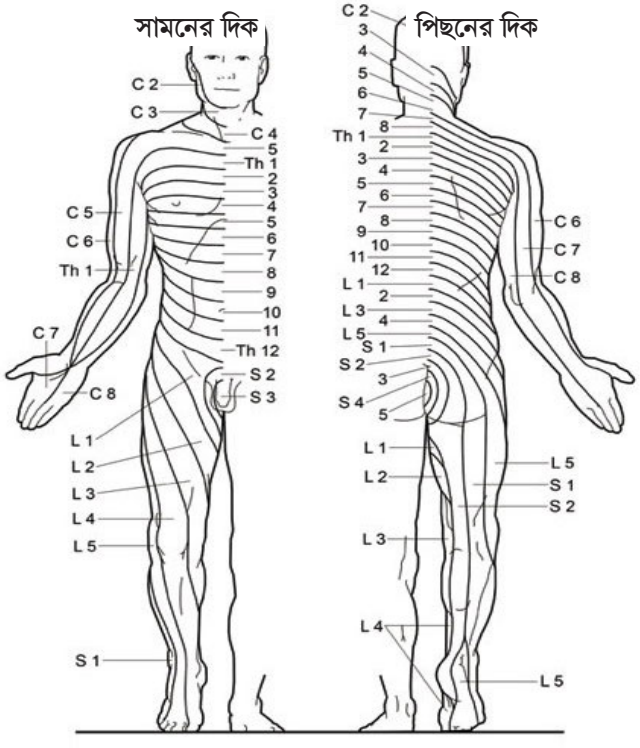


চিত্র ১. সায়াটিক স্নায়ুর ব্যথা হয় L4, L5, S1, S2, S3 অঞ্চলে।

দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেশ ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সায়াটিক স্নায়ু হল আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড়ো স্নায়ু বা নার্ভ। এটি কোমরের কাছে মেরুদণ্ডের পাশে গঠিত হয়ে, পেলভিস বা শ্রোণিচক্র নামক হাড়ের খাঁচার ভেতর দিয়ে পিছন বরাবর গিয়ে, নিতম্ব হয়ে পা বরাবর গিয়ে একদম পায়ের পাতা অব্দি বিস্তৃত থাকে। এই সায়াটিক নার্ভের ওপর চাপ পড়লে বা প্রদাহ হলে তাকে সায়াটিকা বলে। সায়াটিকার ক্ষেত্রে লাগোয়া চিত্রটির গাঢ় অংশে ব্যথা, ঝিন ঝিন বা অসাড় ভাব লক্ষ করা যায়। যদিও বেশির ভাগ সময় পুরো পা বরাবর জুড়েই এই ধরনের উপসর্গ দেখা যায়। আবার দীর্ঘ সময় ধরে বসে বা দাঁড়িয়ে বা সামনের দিকে ঝুঁকে কাজ করার জন্য কোমরের ব্যথা হয় তাকে মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক কোমর ব্যথা বলে।

## কোমরের গঠন সম্পর্কে দু-চার কথা

আমাদের মেরুদণ্ড তেত্রিশটা ছোটো ছোটো হাড় দিয়ে তৈরি, যা কশেরুকা নামে পরিচিত। এই কশেরুকাগুলো অনেকটা বড়ো পাথর বসানো আংটির মতো। জায়গার ওপর ভিত্তি করে এই কশেরুকাগুলো বিভিন্ন মাপের হয়। মেরুদণ্ডে এই কশেরুকাগুলো পর পর থাকে-থাকে সাজানো থাকে, অনেকটা ইটের থামের মতো ও পরস্পরের সঙ্গে অস্থিসন্ধি ও বন্ধনী বা লিগামেন্ট দ্বারা জোড়া থাকে। কশেরুকার ফুটোগুলো একে অপরের সঙ্গে মিশে একটা নলের মতো তৈরি করে যার মধ্যে সুষুম্নাকাণ্ড থাকে। ফলে মেরুদণ্ড সুষুম্নাকাণ্ডকে রক্ষা করে। আমাদের মেরুদণ্ড কিন্তু পুরোপুরি সোজা নয়, বরং সামনে ও পেছন

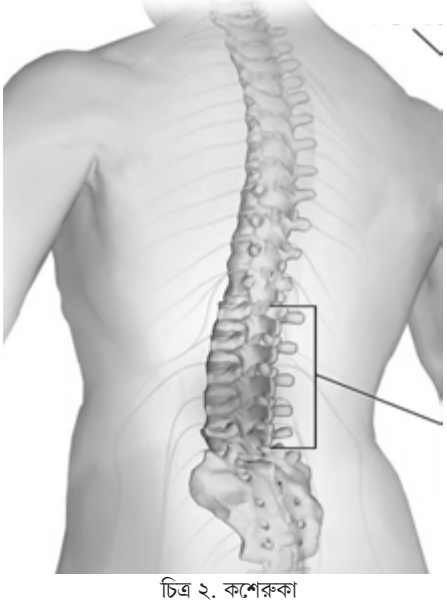

চিত্র ২. কশেরুকা

বরাবর বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু বক্রতা স্বাভাবিকভাবে থাকে। যার ফলে আমাদের ওজন বইতে ও নানা কাজে সুবিধে হয়। আমাদের শরীরের ওজন মেরুদণ্ড হয়ে, পেলভিস বা শ্রোণিচক্রের ভেতর দিয়ে, দু-পা বরাবর মাটিতে নামে। তাছাড়া মেরুদণ্ডের জন্যই আমরা সোজা হয়ে হাঁটতে পারি। নীচের দিকের কয়েকটা বাদে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুটো কশেরুকার কাণ্ডের মধ্যে একটি করে গদির মতো তরুণাস্থির চাকতি থাকে যাকে মেরু চাকতি বা ইন্ট্রা-ভার্টিব্রাল ডিস্ক বলে। নীচের দিকের কয়েকটি বাদে বাকি সব ক্ষেত্রে দুটো কশেরুকার পেছনের দিক থেকে দু-দিক বরাবর স্নায়ু বা নার্ভ বের হয়।

## কেন মেরুদণ্ডের মধ্যে কোমরের ব্যথা সবচেয়ে বেশি হয়?

মেরুদণ্ডের মধ্যে কোমর আর ঘাড় বেশি সচল অংশ। কিন্তু বুকের কশেরুকার ক্ষেত্রে যেমন পাঁজর পাশের দিকে থেকে স্থিতিশীল করে, কোমর বা ঘাড়ের ক্ষেত্রে এমন কোনো ব্যবস্থা নেই। উপরন্তু মেরুদণ্ডের মধ্যে কোমরে সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে কারণ মাথা থেকে শুরু করে দুই হাত ও সমস্ত পেট-বুক পুরো ওজনটাই কোমরের ভেতর দিয়ে যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেরু চাকতি পাতলা হতে শুরু করে।

**বেশিরভাগ কোমরের ব্যথা ও পা বরাবর ব্যথা কোনো চিকিৎসা ছাড়াই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিজের থেকে ঠিক হয়ে যায়। যদি ব্যথা তিন মাস পরেও থাকে তখন তাকে দীর্ঘস্থায়ী বলে ধরা হয়।**

তাছাড়া মেরুদণ্ডের নলের ফুটো সরু ও হাড়ের খোঁচার তৈরির কারণে নার্ভের ওপর চাপ পড়ে। ফলস্বরূপ কোমরের ব্যথা বাড়তে থাকে।

## কারা বেশি ভোগেন?

প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির মধ্যে কোমরের ব্যথা অন্যতম। প্রতি দশ জনে আট জন জীবনকালে কমপক্ষে অন্তত একবার কোমরের ব্যথায় ভোগেন। নারী ও পুরুষ প্রায় সমানভাবে আক্রান্ত হন। যদিও ষাট বছরের পর মহিলাদের ক্ষেত্রে এর তীব্রতা বেশি দেখা যায়। আমেরিকায় পঁয়তাল্লিশের কম বয়সিদের ক্ষেত্রে কোমরের ব্যথার জন্য সবচেয়ে বেশি কাজের দিন নষ্ট হয়। তাছাড়া যে সমস্ত রোগের জন্য দীর্ঘস্থায়ীভাবে ডাক্তারের কাছে রোগীরা আসেন তাদের মধ্যে কোমরের ব্যথা দ্বিতীয়।

- বয়স্করা এই রোগে বেশি ভোগেন। বিশেষত পঞ্চাশ এর পর।
- পেট ও পিঠের মাংসপেশি দুর্বল হলে কোমরের ব্যথার সম্ভাবনা বাড়ে।
- মোটা ও অতিরিক্ত লম্বা আকৃতির মানুষ।
- যে সমস্ত মহিলাদের কম বয়সে বাচ্চা হয়।
- যে মহিলাদের অনেকবার বাচ্চা হয় বা সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা হলে।
- যাদের ভারী কাজকর্ম করতে হয়—ভারী মাল তোলা, ঠেলা বা বওয়া। কলকারখানার কাজ ইত্যাদি।
- অনেকক্ষণ কাঁপুনি যুক্ত কারখানার কাজ যারা করেন।
- যাদের অনেকক্ষণ একইভাবে বসে কাজ করতে হয়—জরির কাজ, বিড়ি বাঁধার কাজ, ড্রাইভার, অনেকক্ষণ কম্পিউটারে বসে কাজ।

## কী কী উপসর্গ দেখা যায়?

- **ব্যথা**—কম থেকে বেশি বিভিন্ন মাত্রায় ব্যথা রোগী অনুভব করেন। যান্ত্রিক কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে একইভাবে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যথা বাড়ে। অনেকের আবার বসে বা শুয়ে থাকলে ব্যথা থাকে না, বরং হাঁটলে ব্যথা বাড়তে থাকে। অনেকের সারাদিনের শেষে রাত্রে ঘুমানোর সময় বেশি ব্যথা হয়। সায়াটিকার ক্ষেত্রে কোমরে ব্যথা থাকতে পারে, কিন্তু বেশি ব্যথা হয় থাইয়ের পেছনের দিকে ও পায়ে।
- **অসাড় ভাব** ।
- **ঝিনঝিনে ভাব** যা কোমর থেকে পা বরাবর নামতে থাকে। অনেকসময় হাঁটলে এই ঝিনঝিনে ভাব বাড়ে।
- পা ও থাইয়ের পেছনের দিকের মাংসপেশির দুর্বলতা থাকতে পারে।

## কী কী কারণে এই ধরনের ব্যথা হতে পারে?

নানা কারণে কোমরের ব্যথা হতে পারে, তবুও সাধারণ কারণগুলি হল—

- জন্মগত কারণ: দুই বা তার বেশি কশেরুকা জন্মগতভাবে জুড়ে থাকা (Congenital fusion of vertebrae), কশেরুকার দু-দিকে খিলানের মাঝে ফাঁক থাকা (spina bifida) অর্থাৎ পাথর বসানো আংটির পাথরের উলটোদিকে রিং-এ ফাঁকা থাকার মতো, কশেরুকার কাণ্ডের অর্ধেকটা না তৈরি হওয়া (hemivertebra) অর্থাৎ অর্ধেক ভাঙা পাথর বসানো আংটির মতো, কশেরুকার খিলান বিকার (spondylolysis), কশেরুকার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরে যাওয়া (spondylolisthesis), জন্মগতভাবে মেরুদণ্ড পাশাপাশিভাবে বেঁকে থাকা (congenital scoliosis) ইত্যাদি।
- আঘাতের কারণে: কোমরের পেশি বা হাড়ে আঘাত লাগলে।
- টিউমারের কারণে: কশেরুকা বা স্নায়ু বা মাংসপেশির টিউমারের কারণে ব্যথা হতে পারে। এই টিউমার ক্যান্সার বা এমনি টিউমার হতে পারে।
- প্রদাহের কারণে: কশেরুকার টিবি (caries spine), টিবি বা অন্য সংক্রমণের কারণে মেনিনজাইটিস (meningitis), রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস (rheumatoid arthritis), আঙ্কাইলোসিং স্পন্ডিলাইটিস (ankylosing spondylitis), ইত্যাদি।

☞ স্লিপড ডিস্ক (prolapsed intervertebral disc)।
☞ বয়সজনিত কারণে কোমরের ব্যথা (spondylosis)।
☞ মানসিক উদ্‌বেগ (anxiety) বা বিষাদ (depression)।
☞ পেচ্ছাপের সংক্রমণ, প্যানক্রিয়াটাইটিস, কিডনির রোগে কোমরের ব্যথা হতে পারে।
☞ মাসিকের সময় মহিলাদের অনেকের কোমরের ব্যথা হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সায়াটিকার মূল কারণ হল স্লিপড ডিস্ক। স্লিপড ডিস্ক-এর ক্ষেত্রে এক বা একাধিক মেরু-চাকতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও স্নায়ুতে চাপের সৃষ্টি করে। অন্যান্য যে কারণগুলির জন্য সায়াটিকা হয় তার মধ্যে অন্যতম হল—স্নায়ু বেরোনোর পথ সরু হয়ে যাওয়া (spinal stenosis), cauda equina syndrome। তাছাড়া আগের উল্লিখিত কারণগুলির জন্যেও সায়াটিকা হতে পারে।

## কী কী পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হতে পারে?

সবচেয়ে বেশি যে পরীক্ষাটি করতে হয় তা হল এক্স-রে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এক্স-রে দেখে রোগের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে এম আর আই করাতে হয়। যদিও এম আর আই খরচসাপেক্ষ। অনেক সময় প্রদাহজনিত কারণ সন্দেহ হলে রক্ত ও মস্তিষ্ক-মেরু রস (cerebrospinal fluid) পরীক্ষা করতে হতে পারে।

## সাধারণ কারণগুলির চিকিৎসা সম্পর্কে কিছু আবশ্যিক তথ্য

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যথা কোনো চিকিৎসা ছাড়াই ছয় সপ্তাহের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ করে কোমরে খুব ব্যথা হলে বা ছয় সপ্তাহের পরও ব্যথা না কমলে কারণ অনুযায়ী নানা ধরনের চিকিৎসা করতে হয়।

✦ ব্যথা কমানোর জন্য স্টেরয়েড ছাড়া অন্যান্য প্রদাহরোধী ঔষধ যথাসম্ভব কম সময়ের জন্য দেওয়া দরকার। যেমন—আইবুপ্রোফেন, ডাইক্লোফেনাক, ইন্ডোমিথাসিন ইত্যাদি। যাদের বয়স বেশি ও গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যা আছে তাদের সঙ্গে গ্যাস-অম্বলের ওষুধ খেতে হয়। যাদের ক্ষেত্রে স্টেরয়েড ছাড়া অন্যান্য প্রদাহরোধী ঔষধে অসুবিধে থাকে ( যেমন—কিডনির সমস্যা, হার্টের সমস্যা, লিভারের সমস্যা) বা যাদের প্রদাহরোধী ঔষধে তেমন ফল পাওয়া যায় না, তাদের ক্ষেত্রে আফিমজাত বেদনানাশক ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। মাংসপেশিতে খিঁচ থাকলে খিঁচ কমানোর ঔষধ ( যেমন—ডায়াজিপাম) দেওয়া দরকার।

✦ মুখে খাওয়ার স্টেরয়েড ব্যবহারে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি (ব্যতিক্রম—কিছু প্রদাহজনিত কারণের চিকিৎসাতে স্টেরয়েড গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ )।

✦ হঠাৎ করে ভারী কোনো জিনিস তুলতে গিয়ে কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলে বা মেরু-চাকতি সরে গেলে, ব্যথা ও খিঁচ কমানোর ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি অন্তত পাঁচ দিন বিছানায় শুয়ে থাকলে বেশির ভাগ সময় এমনিই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া, পেচ্ছাপ-পায়খানা সমস্তটাই বিছানায় শুয়ে। বিছানায় উঠে বসাও বারণ কারণ বসা অবস্থায় কোমরে চাপ সবচেয়ে বেশি পড়ে। যদি আগের থেকে কেউ ব্যায়াম করেন তা বন্ধ রাখুন **পাঁচ দিন**।

✦ অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী কোমর ব্যথাতে স্বল্পমাত্রায় খিঁচুনি আটকানোর ওষুধ (anticonvulsant) বা বিষাদবিরোধী ওষুধ (antidepressant) ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে এই সমস্ত ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি। তাই সাবধানে ব্যবহার করা দরকার ও অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে।

✦ দীর্ঘস্থায়ী কোমর ব্যথাতে আফিমজাত বেদনানাশক ঔষধ ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

✦ কশেরুকার টিবি (caries spine), টিবি বা অন্য সংক্রমণের কারণে মেনিনজাইটিস (meningitis), রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস (rheumatoid arthritis), আঙ্কাইলোসিং স্পন্ডিলাইটিস (ankylosing spondylitis) ইত্যাদি ক্ষেত্রে উক্ত কারণগুলির চিকিৎসা করতে হয়।

হঠাৎ করে ভারী কোনো জিনিস তুলতে গিয়ে কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলে বা মেরু-চাকতি সরে গেলে, ব্যথা ও খিঁচ কমানোর ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি অন্তত পাঁচ দিন বিছানায় শুয়ে থাকলে বেশির ভাগ সময় এমনিই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া, পেচ্ছাপ-পায়খানা সমস্তটাই বিছানায় শুয়ে।

✦ কোমরের কশেরুকা ভেঙে গেলে বা কশেরুকার টিবি হলে ছয় সপ্তাহ শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

✦ বয়সজনিত কারণে কোমরের ব্যথা (spondylosis), কশেরুকার খিলান বিকার (spondylolysis), কশেরুকার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরে যাওয়া (spondylolisthesis), জন্মগতভাবে মেরুদণ্ড পাশাপাশিভাবে বেঁকে থাকা (congenital scoliosis), স্লিপড ডিস্কে বিশ্রাম নেওয়ার পর, ইত্যাদির ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপিস্ট-এর অধীনে ব্যায়াম শিখে নিয়মিত আধ ঘণ্টা ব্যায়াম করা জরুরি।

✦ মানসিক উদ্‌বেগ (anxiety) বা বিষাদ (depression) থাকলে তার যথাযথ চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং করাতে হয়।

✦ ওষুধ বা ব্যায়ামের মাধ্যমে উপসর্গের কোনো উন্নতি না হলে অপারেশান করতে হতে পারে। তবে খুব কম সংখ্যক রোগীর অপারেশান এর দরকার পড়ে ।নানা ধরনের অপারেশান আছে। অপারেশানের নির্দিষ্ট সময় পর থেকে নিয়মিত ব্যায়াম খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় অপারেশান-এর পরও কোনো উন্নতি দেখা যায় না। তাই

অপারেশনের সিদ্ধান্তের আগে চিকিৎসকের সঙ্গে অপারেশনের সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে আলোচনা করুন।

✦ কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিদ্যুতের সাহায্যে কিছু নার্ভকে অকেজো করে দিয়ে (radiofrequency denervation) ব্যথা কমানো হয়। এক্ষেত্রে আগে ওই নার্ভগুলিকে সাময়িকভাবে ব্লক করে দেখে নেওয়া দরকার যে ব্যথা কমছে কিনা। যদিও আমাদের দেশে এই ধরনের চিকিৎসার পরিকাঠামো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

✦ হঠাৎ করে প্রচণ্ড মাত্রায় সায়াটিকা দেখা দিলে সুষুম্নাকাণ্ডের বাইরের আবরণীর ভেতরে অবশ করার ও স্টেরয়েড ইঞ্জেকশান দিলে ভালো কাজ হয়। কিন্তু কেবল মাত্র কোমরের ব্যথাতে, স্নায়ু বেরোনোর পথ সরু হয়ে যাওয়া (spinal stenosis) বা যাদের হাঁটলে পায়ের ব্যথা বাড়ে (claudication) তাদের এই ধরনের ইঞ্জেকশান না দেওয়াই উচিত।

✦ আকুপাংচারে ব্যথার প্রকোপ সাময়িকভাবে কমে কিন্তু রোগের কোনো সুরাহা হয় না। তাই আকুপাংচার না ব্যবহার করাই ভালো।

✦ শর্ট ওয়েভ (short wave) ছাড়া বাকি অন্যান্য ইলেক্ট্রোথেরাপিতে (যেমন—আল্ট্রাসাউন্ড, TENS, PENS) তেমন সুফল মেলে না।

✦ ওজন ঝুলিয়ে টান বা ট্রাকশন (traction) বা বিশেষ শোলের জুতোতে কোনো লাভ হয় না ।

✦ যাদের বার বার স্লিপড ডিস্ক হয় তাদের কোমরে ভারী কাজকর্ম করার সময় বেল্ট ব্যবহার করলে, বেল্ট কোমরের চারপাশে বলয় তৈরি করে কোমরের কশেরুকাতে চাপ কমায়। ফলে স্লিপড ডিস্ক-এর সম্ভাবনা কিছুটা কমে। কিন্তু এই বেল্ট পরে ভারী কাজ করতে অনেকের অসুবিধে হয়। অন্যান্য কারণগুলিতে কোমরের বেল্ট ব্যবহার করলে লাভের চেয়ে ক্ষতি হয় বেশি।

সবশেষে বলার কীভাবে চিকিৎসা হবে তা চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নিন।

## এই ধরনের ব্যথা আটকাতে কী কী করা দরকার?

➢ নিয়মিত ত্রিশ মিনিট করে অ্যারোবিক ব্যায়াম করুন। যেমন- জগিং, সাঁতার, লাফদড়ি, মাঠের খেলাধুলো, সাইকেল চালানো, ইত্যাদি।

➢ কিছু নির্দিষ্ট কোমরের ব্যায়াম করা।

➢ খেলাধুলোর আগে ওয়ার্ম আপ করা।

➢ কাজ করার সময় সঠিকভাবে বসা।

➢ টানা কাজ করার ক্ষেত্রে আধ ঘণ্টা অন্তর পাঁচ মিনিট হাঁটাহাঁটি করে আবার কাজ করতে বসা।

➢ ভারী জিনিস সঠিক পদ্ধতিতে তোলা।

➢ দুই কাঁধে সঠিকভাবে ব্যাগ নেওয়া।

➢ ওজন স্বাভাবিকের থেকে বেশি হলে তা কমানো।

➢ এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী সংখ্যায় করা যাবে।

## কিছু ভুল ধারণা

**গ্যাস-অম্বল থেকে কোমর ও পায়ের ব্যথা হয়:** এহেন কোনো রোগ নেই যার কারণ হিসেবে গ্যাস-অম্বলকে দায়ী করে না মানুষ। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত যার অবাধ যাতায়াতের গল্প। গ্যাস-অম্বলের সঙ্গে কোমরের ব্যথার কোনো সম্পর্ক নেই।

**অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ব্যথা বাড়ে:** ট্রেনের কবিরাজি তেলের হকার ও বাবাজিদের প্রচারের দৌলতে আমরা অনেকেই এটা বিশ্বাস করি। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ মিথ্যে।

**নির্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম করতে হয়:** এরকম কোনো নিয়ম নেই। যেকোনো সময়ে করতে পারেন। তবে নির্দিষ্ট সময়ে করলে অভ্যাস হয়ে যায়। এটাই সুবিধের।

**রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস (rheumatoid arthritis), আঙ্কাইলোসিং স্পন্ডিলাইটিস (ankylosing spondylitis) ভালো হয়ে যায়:** ভুল ধারণা। ওষুধ খেলে ব্যথা কমে ও রোগ সীমার মধ্যে থাকে। ওষুধ বন্ধ করলেই প্রকোপ বাড়ে। একবার রোগ ধরা পড়লে

নিয়মিত ত্রিশ মিনিট করে অ্যারোবিক ব্যায়াম করুন। যেমন- জগিং, সাঁতার, লাফদড়ি, মাঠের খেলাধুলো, সাইকেল চালানো, ইত্যাদি।

সারাজীবন ওষুধ খেতে হয়।

**বয়সজনিত কারণে কোমরের ব্যথা (spondylosis)-তে সামনে ঝুঁকে কাজ করা ও ভারী জিনিস তোলা বারণ:** এরকম কোনো ব্যাপার নেই। তবে যেকোনো ভারী ওজন তোলার সময় সাবধানে ও সঠিক পদ্ধতিতে তোলা জরুরি।

**বয়সজনিত কারণে কোমরের ব্যথা (spondylosis) হলে মাটিতে বা বিছানা ছাড়া শক্ত খাটে এবং বালিশ ছাড়া শুতে হয়:** একদম তুলোর মতো নরম গদিতে না শোয়াই ভালো। কিন্তু আপনার যেমনভাবে যে বিছানায় শুয়ে অভ্যেস তেমনভাবেই ঘুমান। কোনো অসুবিধে নেই।

**পা বরাবর ব্যথা হলে কোমরের এক্স-রে করানোর দরকার আছে?** হ্যাঁ করতে হতে পারে। কেন করতে হতে পারে তা আগেই বলা হয়েছে।

**ঠান্ডা-গরম সেঁকে লাভ হয়?** ঠান্ডা বা গরম সেঁক নিয়ে আরাম লাগলে নিতে পারেন। এতে সাময়িক আরাম লাগে। লাভ বা ক্ষতি কোনোটাই হয় না। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. মৃন্ময়, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি এক ক্লিনিকের চিকিৎসক।

# জলবসন্ত

মনে করো তুমি নেই, বসন্ত এসে গেছে—
কবিরা কাব্যি করেই খালাস, কিন্তু বসন্ত যদি সত্যিই এসে যায়, হুমড়ি খেয়ে পড়ে আপনার ঘাড়ে, তখন 'কোথা হা হন্ত চিরবসন্ত আমি বসন্তে মরি' বলে তাঁরা দ্রুত অদৃশ্য হবেন, সন্দেহ নেই। তবে সে বসন্ত আজকাল যে বসন্তরোগ দেখি সেটাই কী? নয় বোধহয়, লিখছেন **ডা. জয়ন্ত দাস**।

চিত্র ১. জলবসন্তের র‍্যাশ

প্রথমেই একটা ব্যাপার খোলসা করে বলে রাখি। দুটো আলাদা আলাদা রোগকে 'বসন্ত' নাম দেওয়া হয়েছে, জলবসন্ত আর গুটিবসন্ত। ইংরাজিতেও দুটো আলাদা রোগ পক্স বলে পরিচিত, চিকেন পক্স অর্থাৎ জলবসন্ত, আর স্মল পক্স মানে গুটিবসন্ত। স্মল পক্স বা গুটিবসন্ত অতি মারাত্মক রোগ, এবং এই একটা রোগ মূলত টিকা দেবার সাহায্যে মানবজাতি সচেতন প্রয়াসে পৃথিবী থেকে নির্মূল করে ফেলেছে চল্লিশ বছরেরও বেশি আগে। কেবল কিছু পরীক্ষাগারে গুটিবসন্তের বীজাণু বা ভাইরাস কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। চিকেন পক্স বা জলবসন্ত তুলনায় নেহাত সামান্য একটা রোগ, এতে মৃত্যু হয় না বললেই চলে। কিন্তু নামমাহাত্ম্যে মানুষ একে ভয় পান, ও গুটিবসন্তের সমস্ত প্রাচীন ধারণা, সংস্কার ও রীতি এই রোগের ক্ষেত্রে আরোপ করেন। যদিও সেগুলোর অধিকাংশই হল কুসংস্কার, তবু কয়েকটা হয়তো গুটিবসন্তের জন্য ঠিক ছিল। কিন্তু জলবসন্তের জন্য প্রায় কোনোটাই সঠিক নয়।

আমরা এই নিবন্ধে এরপর থেকে যা যা বলব, তা জলবসন্ত নিয়ে, তাই আলাদা করে জলবসন্ত বা চিকেন পক্স নামটা ব্যবহার না করে স্রেফ বসন্ত বা পক্স বলেই এই রোগটা বোঝাব।

টিকা দেওয়া না হয়ে থাকলে অধিকাংশ বাচ্চার বসন্ত হয়। তবে আমার নিজের বসন্ত ছোটোবেলায় হয়নি, হল ত্রিশ বছর বয়সে। এরকম বেশি বয়সে বসন্ত হতেই পারে। একই মানুষের দু-বার বসন্ত হবার সম্ভাবনা খুব কম।

রোগটা তেমন ভয়াবহ কিছু নয়, আর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে মোটামুটি সেরে যায়, অবশ্য দাগ থাকে বহুদিন। তবে বিপদ হল একদম ছোট্ট বাচ্চার, গর্ভবতী মায়ের, আর যার কোনো কারণে রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা (immune system) কমজোরি হয়ে গেছে, তার।

রোগের লক্ষণ, বাড়িতে চিকিৎসা করার উপায়, কখন ডাক্তার ডাকা দরকার, কী করে রোগ ছড়ায়, কী কী জটিলতা হতে পারে—এইসব কথাই আমরা এখানে বলব।

## রোগের লক্ষণ

রোগের ভাইরাস শরীরে ঢোকার এক সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ পরে রোগলক্ষণ দেখা দেয়। মূল লক্ষণ হল চামড়ায় র‍্যাশ। তবে তার সঙ্গে জ্বর, গায়ে ব্যথা, মাথা ব্যথা, অখিদে—এসবও থাকে। র‍্যাশ বেরোনোর তিনটি ধাপ। প্রথমে লাল দাগ, তারপর জলফোসকা, তারপর খোসা ওঠা। সাধারণত প্রথমে মুখে বা বুকে লাল দাগ বেরোয় ও সেটা ছড়ায়। তারপর কয়েক ঘণ্টা থেকে একদিনের মধ্যে লালচে ফুসকুড়ি বেরোয়, সেগুলো জলভর্তি হয়ে যায় আর খুব চুলকায়। তার কয়েকদিন পর ফুসকুড়িগুলোর মামড়ি পড়ে ও খোসা ওঠে—এই পর্ব দু-এক সপ্তাহ ধরে চলতে পারে।

লোকের ধারণা, এই মামড়ি বা খোসাগুলো খুব ছোঁয়াচে, তাই অনেকে এগুলো জড়ো করে পুড়িয়েও দেন। কিন্তু এগুলোতে ভাইরাস থাকে না, এগুলো থেকে আর কারও রোগ হয় না। গায়ে র‍্যাশ বের হবার দিন দুয়েক আগে থেকে রোগীর নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাস বেরোতে থাকে, তা থেকে অন্যের রোগ হতে পারে। আর যতদিন ফুসকুড়িগুলোতে মামড়ি না হচ্ছে, ততদিন রোগী ছোঁয়াচে থাকেন—অর্থাৎ লাল দাগ শুরু হবার পরে দিন ছয়েক মতো। আমাদের দেশে তারপর অনেকদিন, সাধারণত ২১ দিন, রোগীকে ঘরে আটকে রাখা হয়, তার যুক্তি নেই। তবে সুকুমার রায় হয়তো বলতেন, শিবঠাকুরের আপন দেশে একুশে আইন-ই চলে।

## বাড়িতে রেখে কীভাবে চিকিৎসা করবেন?

✦ সাধারণত বাড়িতেই এ-রোগের চিকিৎসা ভালোভাবে করা যায়। হয়তো রোগীর বেশ কষ্ট হবে, কিন্তু সেই কষ্ট বাড়িতেই লাঘব করা যায়।

✦ জ্বর আর গায়ে ব্যথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল ছাড়া আর কোনো ওষুধ (যেমন আইবুপ্রোফেন) দেবেন না, তাতে বিপদ হতে পারে।

✦ ক্যালামিন লোশন জাতীয় চুলকানি কমানোর ওষুধ দিতে পারেন, আর চামড়া শুষ্ক, খড়ি-ওঠা হলে ময়েসচারাইজিং লোশন দিন (আমাদের দেশে ওষুধ হিসেবে যেসব ময়েসচারাইজিং লোশন বিক্রি হয় তাদের অনেকগুলোয় স্যালিসাইলিক অ্যাসিড বা ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে, সেগুলো দেবেন না)।

✦ চুলকানোর বদলে হালকা করে কিছু বুলিয়ে বা সামান্য ঘষে দিন। আমাদের দেশে গায়ে নিমপাতা বোলানোর প্রথা আছে, সেটা খারাপ নয়, তবে দেখতে হবে পাতাগুলো যেন পরিষ্কার হয়।

✦ প্রচুর জল, শরবত এসব দিন।

রোগ যাতে রোগীর থেকে অন্যের দেহে না ছড়ায় সে ব্যবস্থাও নিতে হবে। ফুসকুড়ি থাকাকালীন স্কুল, অফিস, বা অন্য ডিউটি করা চলবে না।

## কখন ডাক্তার ডাকবেন?

➢ প্রায় সব ক্ষেত্রেই বসন্ত নিজেই সেরে যায়, ডাক্তার দেখাতেই হবে এমন কথা নেই। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে ডাক্তার ডাকতেই হবে।

➢ ডাক্তার ডাকার সব থেকে সাধারণ কারণ হল, যখন রোগটাকে নিশ্চিতভাবে চিনতে পারছেন না।

➢ রোগগ্রস্ত বাচ্চা খুব ছোটো হলে, বিশেষ করে একমাসেরও কমবয়সি বাচ্চার ক্ষেত্রে ডাক্তার দেখাতেই হবে।

➢ বেশি বয়সে বসন্ত হলে।

➢ র‍্যাশ বেরোনোর ছয় দিনের মধ্যে রোগলক্ষণের উন্নতি একেবারেই না হলে।

➢ যদি আপনি গর্ভবতী হন বা আপনার রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা (immune system) কমজোরি, এটা জানা থাকে। এসব ক্ষেত্রে এমনকী বসন্ত না হলেও ডাক্তার দেখাতে হতে পারে, যদি আপনি কোনো ছোঁয়াচে বসন্তরোগীর সংস্পর্শে এসে থাকেন।

➢ যদি বসন্তরোগের নানা জটিলতার কোনোটি দেখা দেয়। সাধারণ জটিলতাগুলো হল চামড়া ফুলে গিয়ে ব্যথা করা, শ্বাসকষ্ট, ও শরীরে জলের ভাগ কমে যাওয়া (dehydration)।

## কীভাবে আপনার শরীরে বসন্তরোগ আসতে পারে?

বসন্তরোগ একটি ভাইরাস দ্বারা হয়। যদি আপনার আগে কোনোদিন বসন্তরোগ না হয়ে থাকে তো সহজেই এই বীজাণু আপনার শরীরে জেঁকে বসতে পারে। কিন্তু একবার রোগটা হয়ে গেলে বাকি জীবনে আবার তা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

রোগীর শরীরের ফুসকুড়ির জলীয় পদার্থে অনেক ভাইরাস থাকে। রোগলক্ষণ দেখা দেবার দু-দিন আগে থেকে সব ফুসকুড়ির মামড়ি ওঠা পর্যন্ত রোগীর হাঁচিকাশি, নিশ্বাস আর চামড়ার র‍্যাশ থেকে ভাইরাস ছড়ায়। তাই রোগীর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বললে, বা এক ঘরে মিনিট পনেরো থাকলে, আপনার শরীরে রোগ হবার মতো যথেষ্ট সংখ্যায় ভাইরাস ঢুকে পড়তে পারে।

তবে সরাসরি রোগীর শরীর থেকেই যে ভাইরাস আপনার শরীরে ঢুকবে তা না-ও হতে পারে। এই ভাইরাস শরীরের বাইরে কিছুদিন বেঁচে থাকে। ফলে ভাইরাস থাকতে পারে টেবিল, দরজার হাতল এ-সমস্ত জায়গায়, বাসে ট্রেনে, খেলনায়, বিছানা-সোফায়। আর এসব জায়গা থেকে ভাইরাস আপনার শরীরে ঢুকে রোগ ঘটাতে পারে। ফলে এটা ঠেকানো খুব শক্ত। তবে এক মানুষের শরীর থেকে অন্য মানুষের শরীরে অনেক বেশি সংখ্যায় ভাইরাস যেতে পারে, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এভাবেই রোগ আপনার শরীরে আসে।

**গর্ভাবস্থায় বসন্ত হলে, গর্ভধারণের কতদিন পরে বসন্ত হয়েছে, তার ওপর গর্ভের বাচ্চার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নির্ভর করে। গর্ভধারণ করার ২৮ সপ্তাহের আগে মায়ের বসন্ত হলে গর্ভ নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ভ্রূণের 'ভ্যারিসেলা সিনড্রোম' হতে পারে। তাতে ভ্রূণের চামড়া, চোখ, পা, হাত, মস্তিষ্ক, মূত্রথলি ও অন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।**

হারপিস জস্টার রোগ ও জলবসন্ত রোগ একই ভাইরাস থেকে হয়। ফলে হারপিস জস্টার রোগীর গায়ের ফোসকা থেকে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু তা অন্যের শরীরে হারপিস জস্টার করে না, বরং জলবসন্ত তৈরি করে। হারপিস জস্টার রোগটা কেবলমাত্র তার শরীরে হতে পারে যার শরীরে আগে জলবসন্ত রোগ হয়েছিল। এই ভাইরাস শরীরের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় লুকিয়ে থাকে বছরের পর বছর, তারপর হারপিস জস্টার রোগ ঘটায়।

## বসন্ত থেকে কী কী জটিলতা হতে পারে?

অধিকাংশ রোগীর কোনো জটিলতা হয় না, ও তাঁরা দিব্যি সেরে ওঠেন। কিন্তু অল্প কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বা মারাত্মক জটিলতা হয়। বেশিবয়স্ক বা অতি ছোটো শিশু, গর্ভবতী মহিলা, আর যাদের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা (immune system) কমজোরি, তাদের কিছু মারাত্মক জটিলতা হবার সম্ভাবনা বেশি।

☞ বসন্তের ফুসকুড়ির ওপর ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ—এটা খুবই দেখা যায়, যে-কারোরই অল্পস্বল্প এরকম সংক্রমণ হতে পারে।

☞ ফুসফুসে সংক্রমণ বা নিউমোনিয়া—এটা অবশ্য গড়পরতা মানুষের হয় না বললেই চলে, বেশি ঝুঁকি যাদের, তাদেরই হয়। কাশি, শ্বাসকষ্ট আর বুকে ব্যথা হল এর মূল লক্ষণ।

☞ হারপিস জস্টার—এটা পরবর্তী জীবনে যে-কারোরই হতে পারে। একবার বসন্ত হলে তার ভাইরাস শরীরের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় লুকিয়ে থাকে বছরের পর বছর, পরে চামড়ায় হারপিস জস্টারের ব্যথাযুক্ত ফোসকা তৈরি করে।

☞ গর্ভাবস্থার সমস্যা—এটা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। আপাতত এটুকু বলা যাক যে মায়ের রোগ হলে গর্ভের বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে।

## গর্ভাবস্থার বসন্তরোগের সমস্যা

গর্ভাবস্থায় বসন্ত হলে মায়ের বা গর্ভের বাচ্চার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা খুব কম। তবে মা গর্ভবতী অবস্থায় যদি ধূমপান করেন, যদি তাঁর ব্রঙ্কাইটিস বা ঐরকম ফুসফুসের রোগ থাকে, আগের তিন মাসে বেশ কিছুদিন স্টেরয়েড ওষুধ খেয়ে থাকেন ও গর্ভাবস্থার অর্ধেকের বেশিদিন কাটানোর (২০ সপ্তাহের চেয়ে বেশিদিন গর্ভবতী) পরে বসন্ত হয়, তবে মায়ের নিজের নানা জটিলতা হতে পারে। মায়ের সম্ভাব্য জটিলতাগুলো হল ফুসফুসে প্রদাহ বা নিউমোনিয়া, এনকেফেলাইটিস (মস্তিষ্কের প্রদাহ) এবং হেপাটাইটিস (লিভারের প্রদাহ)। এসব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু যথাসময়ে চিকিৎসা হলে সেটা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

গর্ভাবস্থায় বসন্ত হলে, গর্ভধারণের কতদিন পরে বসন্ত হয়েছে, তার ওপর গর্ভের বাচ্চার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নির্ভর করে। গর্ভধারণ করার ২৮ সপ্তাহের আগে মায়ের বসন্ত হলে গর্ভ নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ভ্রূণের 'ভ্যারিসেলা সিনড্রোম' হতে পারে। তাতে ভ্রূণের চামড়া, চোখ, পা, হাত, মস্তিষ্ক, মূত্রথলি ও অন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গর্ভধারণ করার ২৮ সপ্তাহ থেকে ৩৬ সপ্তাহের মধ্যে মায়ের বসন্ত হলে ভ্রূণের শরীরে রোগের বীজাণু ভাইরাস প্রবেশ করে, কিন্তু সাধারণত কোনো রোগলক্ষণ দেখা দেয় না। বাচ্চা জন্মানোর পরে, যখন তার বয়স কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর, তার হারপিস জস্টার দেখা দিতে পারে। গর্ভধারণ করার ৩৬ সপ্তাহের পরে মায়ের বসন্ত হলে ভ্রূণের শরীরে রোগের বীজাণু ভাইরাস প্রবেশ করে, ও তার বসন্তরোগ নিয়ে জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে।

**নবজাতকের (চার সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত) বসন্তরোগের সমস্যা**—আগেই বলেছি, গর্ভাবস্থার শেষ দিকে মায়ের বসন্ত হলে বাচ্চার শরীরে তা দেখা দিতে পারে। আবার শিশুকে জন্ম দেবার পরের সাতদিনের মধ্যে মায়ের বসন্ত হলেও নবজাতকের বসন্ত হতে পারে। এটা বেশ গুরুতর রোগ।

## গর্ভাবস্থায় বসন্তরোগীর সংস্পর্শে এলে কী করা উচিত?

গর্ভাবস্থায় বসন্ত গুরুতর রোগ হিসেবেই ধরা হয়। যদি আগেই মায়ের বসন্ত হয়ে থাকে তাহলে কিছু করার দরকার নেই, কারণ দ্বিতীয়বার বসন্ত হয় না বললেই চলে; তবুও তারপর চামড়ায় কোনো র‍্যাশ বেরিয়ে থাকলে ডাক্তার দেখান, তাঁকে বলুন আপনি বসন্তরোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু যদি মায়ের জীবনে বসন্তরোগ না হয়ে থাকে, বা হয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকে, তবে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। আর বসন্তরোগীর সংস্পর্শে না এসে থাকলেও, যদি কোনো হারপিস জস্টার রোগীর সংস্পর্শে এসে থাকেন তাহলেও ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। এই সব-ক্ষেত্রেই ডাক্তার দরকার বুঝলে ওষুধ দেবেন। এছাড়াও গর্ভাবস্থায় বসন্ত হয়েছে বলে সন্দেহ হলেই ডাক্তার দেখান।

মনে রাখবেন, বসন্তরোগের র‍্যাশ বেরোনোর দু-দিন আগে থেকেই রোগীর হাঁচি কাশি ইত্যাদি থেকে ভাইরাস বেরোয়, তা থেকে রোগ ছড়াতে পারে। সুতরাং যদি জানতে পারেন যে এমন কারও বসন্ত হয়েছে যার কাছাকাছি আপনি ছিলেন র‍্যাশ বেরোনোর দু-একদিন আগে, তাহলেও ডাক্তার দেখান।

## বসন্তের টিকা

আগেই বলেছি, মারাত্মক গুটি বসন্তরোগটি মূলত টিকাকরণের সাহায্যে পৃথিবী থেকে নির্মূল করা গেছে। কিন্তু জল বসন্ত, যা নিয়ে এই নিবন্ধ, তারও টিকা আছে। তা এখনও ভারতের জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচির আওতার বাইরে, যদিও ভারতের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের অ্যাসোসিয়েশন এই টিকা দিতে বলছে। ব্রিটেনে এখনও পর্যন্ত কেবল 'হাই রিস্ক' রোগীদের এই টিকা দেওয়া হয়।

এই টিকাতে জীবন্ত কিন্তু কমজোরি বসন্ত ভাইরাস থাকে। তা শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জাগিয়ে তুলে অ্যান্টিবডি তৈরি করে কাজ করে। ওপর হাতে চার থেকে আট সপ্তাহ ব্যবধানে দুটো ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে এই টিকা দেওয়া হয়। শৈশবে দিলে এটা শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে কার্যকর। বেশি বয়সে দিলে কাজ ততটা হয় না।

এই হল চিকেন পক্স তথা জল বসন্ত নিয়ে রোগীদের জানার প্রয়োজনীয় কথা।

ঋণস্বীকার: ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য একটি ওয়েবসাইট http://www.nhs.uk/conditions/chickenpox/Pages/Introduction.aspx চালান, সেটি থেকে ২ অক্টোবর এই লেখা তৈরির মূল উপাদান নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এম ডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

# বাঙালির যৌনতা ধারণা, ডাক্তারি ও ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট

ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (NHS)-এর ওয়েবসাইটে যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক লেখাগুলোর সব ক-টা লেখাই খুব সাধারণ কিছু প্রশ্নের উত্তরের আকারে লেখা। যেসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে ওঠে, বিশেষ করে কৈশোরে পা দেওয়া ছেলেমেয়েদের, কিন্তু যৌনতা সম্পর্কে সুস্থ আলোচনা আমরা প্রকাশ্যে করতে পারি না। কে যেন আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যৌনতা জিনিসটা যেমন খারাপ, এটা নিয়ে আলোচনা করাও তেমন খারাপ। অথচ যৌনতা জীবনেরই এক গুরুত্বপূর্ণ, অবিচ্ছেদ্য অংশ। একে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে যেটা হয় যে বয়ঃসন্ধিতে এ নিয়ে যেসব প্রশ্ন মনে ওঠে স্বাভাবিক নিয়মেই, কিন্তু সেগুলো নিয়ে সুস্থ আলোচনা করা যায় না কারও সঙ্গে। যৌনতা আমরা লুকিয়ে-চুরিয়ে শিখি বন্ধুদের কাছে, ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফি সাইট থেকে, আর সমাজের কানাঘুষো, ফিসফিসানি থেকে। আর সুস্থ স্বাভাবিক যৌনতার বদলে একটা বিকৃত অবদমিত আকৃতি

. . . বয়ঃসন্ধিতে এ নিয়ে যেসব প্রশ্ন মনে ওঠে স্বাভাবিক নিয়মেই, কিন্তু সেগুলো নিয়ে সুস্থ আলোচনা করা যায় না কারও সঙ্গে। যৌনতা আমরা লুকিয়ে-চুরিয়ে শিখি বন্ধুদের কাছে, ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফি সাইট থেকে, আর সমাজের কানাঘুষো, ফিসফিসানি থেকে।

খাড়া হয় মনের মধ্যে। সেই অ-জ্ঞান আমরা ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাই বন্ধু থেকে বন্ধুতে, পিতামাতা থেকে সন্তানে। যৌনতাকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলার উপায় নেই, একে ভালো করে জানার উপায় নেই, মনে প্রশ্ন উঠলে ভালো করে বুঝিয়ে বলার লোক নেই। এক অদ্ভুত সমস্যায় পড়ি আমরা। ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস এই সাধারণ প্রশ্নগুলোকেই সহজভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সব প্রশ্নের উত্তর একটা লেখায় দেওয়া সম্ভব নয়। পরে আবার লেখা হবে। NHS-এর ওয়েবসাইট থেকেও সরাসরি পড়ে নিতে পারেন (www.nhs.co.uk)

আগেই একটা চেতাবনি। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে লেখাটার কিছু কিছু অংশ অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় বাদ দিতে বা অন্যরকম করে লিখতে হয়েছে। যেমন কেউ যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনো সমস্যায় পড়লে ওখানে স্থানীয় জেনারেল প্র্যাক্টিশনারের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। আমাদের দেশে জেনারেল প্র্যাক্টিশনাররা বিলুপ্তপ্রায়, আর যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ের কোনো বিশেষজ্ঞ নেই। আছেন কিছু স্বঘোষিত 'সেক্সোলজিস্ট' যারা গ্যারান্টি সহকারে ক্ষুদ্র লিঙ্গ, বক্র লিঙ্গ, শীঘ্রপতন, গুপ্ত রোগের চিকিৎসা করেন।

এবার আসল কথাগুলোয় আসা যাক।

## ১. হস্তমৈথুন কি অস্বাভাবিক?

একদমই না। হস্তমৈথুন একটি অতি সাধারণ ও সুস্থ স্বাভাবিক যৌন অভ্যাস। প্রায় সমস্ত বয়সের মানুষই হস্তমৈথুন অভ্যাস করেন। বেশিরভাগ মানুষের প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতায় হাতেখড়ি হয় হস্তমৈথুনের মাধ্যমে। তবে হস্তমৈথুন না করলেই আপনি অসুস্থ তাও কিন্তু নয়। আপনি না চাইলে বা পছন্দ না করলে নাও করতে পারেন।

## ২. হস্তমৈথুন আসলে কী?

হস্তমৈথুন বলা হয় আমাদের জননাঙ্গকে স্পর্শের মাধ্যমে (প্রধানত হাত দিয়ে) যৌন আনন্দ পাওয়াকে। হস্তমৈথুনের মাধ্যমে নিজে আনন্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীকেও আনন্দ দেওয়া যায়। হস্তমৈথুনের শেষ পর্যায়ে সাধারণত রাগমোচন বা অর্গাজম (Orgasm) হয়। আমরা এই লেখায় এবার থেকে অর্গাজম শব্দটিই ব্যবহার করব।

সাধারণত ছেলেরা হাত দিয়ে লিঙ্গকে ধরে উপরে-নীচে ঘর্ষণ করে হস্তমৈথুন করে। আর মেয়েরা হাত বা আঙুল দিয়ে ক্লাইটোরিস ও যোনি বা ভ্যাজাইনার কাছে ঘর্ষণ করে হস্তমৈথুন করে। তবে মানুষভেদে এই অভ্যাসেরও তারতম্য হতে পারে, এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই যে এভাবেই হস্তমৈথুন করা উচিত।

## ৩. হস্তমৈথুন করলে কি কোনো শারীরিক ক্ষতি হতে পারে?

হস্তমৈথুন করলে কোনো শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি হয় না। অনেকবার করলেও না। তবে কম সময়ের মধ্যে বেশিবার হস্তমৈথুন করলে জননাঙ্গে ব্যথা বা জ্বালা করতে পারে। লিঙ্গ-যোনি সংসর্গের তুলনায় হস্তমৈথুনের মাধ্যমে যৌন সংবাহী রোগ (Sexually Transmitted Disease) এক ব্যক্তির দেহ থেকে অন্য ব্যক্তির দেহে ছড়ানোর সম্ভাবনা কম। হস্তমৈথুন নিয়ে কথা বলতে আমরা লজ্জা পাই, কিন্তু আদপেই

এটা কোনো লজ্জাকর বা অসুস্থ অভ্যাস নয়। তবে অত্যধিক হস্তমৈথুন যা কিনা দৈনন্দিন কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করে বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারবার হস্তমৈথুনের প্রতি আসক্তি তৈরি হওয়া Impulse Control Disorder নামক এক ধরনের মানসিক রোগের মধ্যে পড়ে, যেটা কিনা যেকোনো অভ্যাসের ক্ষেত্রেই হতে পারে। হস্তমৈথুন কোনো মানসিক রোগ নয়।

## ৪. রাগমোচন বা অর্গাজম কী?

যৌনক্রীড়ার চরম মুহূর্তে যে তীব্র উত্তেজনা হয় তাকে অর্গাজম বলে। ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই অর্গাজম হতে পারে।

## ৫. অর্গাজমের সময়ে কী কী হয়?

অর্গাজম হওয়ার সময় হৃদ্‌স্পন্দনের গতি বাড়ে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও বাড়ে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে যোনি ও তার সংলগ্ন পেশির ক্রম-সংকোচন ও প্রসারণ হয়, ও তীব্র উত্তেজনার প্রশমন ঘটে। মেয়েদের পর পর দু-বার অর্গাজমের মধ্যে ব্যবধান খুব কম হতে পারে বা নাও থাকতে পারে, যদি যৌন উত্তেজনা তখনও থাকে। কিছু কিছু মেয়েদের ক্ষেত্রে মূত্রনালী সংলগ্ন 'স্কীন গ্ল্যান্ড' (Skene Gland) থেকে ক্ষরণ হতে পারে যাকে মেয়েদের যৌন ক্ষরণ (Female Ejaculation) বলে।

ছেলেদের ক্ষেত্রে লিঙ্গের পেশির ক্রম সংকোচন প্রসারণের ফলে বীর্য নিঃসৃত হওয়ার মাধ্যমে অর্গাজম হয়। একবার অর্গাজমের পর আবার যৌন উত্তেজনা ফিরে আসতে ছেলেদের বেশ কিছুটা সময় লাগে। সেটা কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টাও হতে পারে।

## ৬. যৌন আনন্দ লাভের জন্যে অর্গাজম কি আবশ্যক?

অর্গাজম যৌন আনন্দের একটি দিক মাত্র। অর্গাজম ছাড়াও আরও বিভিন্নভাবে যৌন আনন্দ পাওয়া যেতে পারে। যৌন আনন্দের চরম যে অর্গাজম ও অর্গাজম না হওয়া মানে যে যৌনতার অসম্পূর্ণতা, তা ভাবা ভুল।

অনেকের অর্গাজম লিঙ্গ-যোনি মিলনের মাধ্যমে আসে না, হস্তমৈথুনের মাধ্যমে আসে। অনেকের ক্ষেত্রে অর্গাজম হয়ই না। এর জন্যে যৌনমিলন সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব, যথেষ্ট উত্তেজনার অভাব, মিলনের ক্ষেত্রে সঠিক বোঝাপড়ার অভাব, উভয়ের একই সঙ্গে মিলনে ইচ্ছা না হওয়া, মিলনের চরম মুহূর্তে পৌঁছোনোর আগেই যৌনসঙ্গীর অর্গাজম হয়ে যাওয়া, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি কারণে যেকোনো একজনের বা দু-জনেরই অর্গাজম নাও হতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে অতীত যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা তিক্ত হওয়ার কারণে মিলিত হতে অসুবিধা হয়। এসব অনেক সমস্যাই পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্যে কিছুটা সময় দিলে কাটানো সম্ভব। তাতে কাজ না হলে, কিংবা কোনো শারীরিক অসুবিধার কারণে মিলনে অসুবিধা হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

শারীরিক কোনো অসুবিধা থাকলে ডাক্তার তার চিকিৎসা করবেন। শারীরিক কোনো অসুবিধা না থাকলে ডাক্তার, সাইকায়াট্রিস্ট ডাক্তার ও সাইকোলজিস্টের পরামর্শ চাইতে পারেন। সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং বা সেক্স থেরাপির মাধ্যমে একে অন্যের মানসিক সমস্যা, চাহিদা ও অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীলতা ও যৌনতার বিভিন্ন মাত্রার আনন্দগুলির সঙ্গে পরিচয় করানোর চেষ্টা করানো হয়। শুধুমাত্র লিঙ্গ-যোনি মিলন বা শুধু অর্গাজমই যে যৌন আনন্দের একমাত্র উৎস নয় তা বোঝা দরকার। যৌন আনন্দ বিভিন্নভাবে পাওয়া যেতে পারে, অসংখ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পাওয়া যেতে পারে, যেমন অন্যের শরীরকে ভালো করে আদর করা, একসাথে স্নান করা, চুম্বন করা, একে অন্যকে অনাবৃত করা, মিলনের আগে অন্যের সঙ্গে সময় কাটানো, পরস্পরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভালো লাগা খারাপ লাগার খোঁজ নেওয়া, প্রয়োজন হলে মৌখিক যৌনতা, বা হস্তমৈথুনের ব্যবহার করা ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রায় যৌন আনন্দকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। পর্নোগ্রাফিতে যেরকম দেখানো হয়, সেটাই যৌনতার একমাত্র অভ্যাস নয়, আর তা করতে না পারলে হীনম্মন্যতায় ভোগাও একদমই উচিত নয়।

## ৭. মৌখিক যৌনাচার (Oral Sex) কী?

মুখ, জিভ বা ঠোঁটের মাধ্যমে সঙ্গীর যৌনাঙ্গকে উত্তেজিত করার প্রক্রিয়াকে মৌখিক যৌনাচার বলে। মৌখিক যৌনাচারের মধ্যে মুখ দিয়ে পুরুষের লিঙ্গ লেহন করা (যাকে মুখমেহন বা Fellatio বলে), মেয়েদের যোনি, ক্লাইটোরিস লেহন করা (একে যোনিলেহন বা Cunnilingus), বা পায়ুলেহন বা Anilingus করা যেতে পারে।

## ৮. মৌখিক যৌনাচার কি খুব সাধারণ ব্যাপার?

অনেকেই লিঙ্গ-যোনি যৌনাচারের সঙ্গে বা তার বিকল্প হিসেবে মৌখিক যৌনাচার অভ্যাস করে থাকেন। এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই।

## ৯. মৌখিক যৌনতার ফলে কি গর্ভসঞ্চার হতে পারে?

না। যতক্ষণ বীর্যের শুক্রাণু, স্ত্রী-দেহের ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত না হচ্ছে ততক্ষণ গর্ভসঞ্চারের কোনো সম্ভাবনা নেই। মৌখিক যৌনাচারের সঙ্গে লিঙ্গ-যোনি সঙ্গমও হলে গর্ভসঞ্চার স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে।

## ১০. মৌখিক যৌনাচারের মাধ্যমে কী কী রোগ সংক্রামিত হতে পারে?

মৌখিক যৌনাচারের মাধ্যমে সাধারণভাবে জেনিটাল হার্পিস, গনোরিয়া ও সিফিলিস রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া ক্ল্যামাইডিয়াসিস (এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ), জেনিটাল ওয়ার্ট (প্যাপিলোমা ভাইরাস-ঘটিত সংক্রমণ), ভাইরাল হেপাটাইটিস-এ, বি, সি, এইচ-আই-ভি ও যৌনকেশের উকুনের সংক্রমণও হতে পারে, তবে তার সম্ভাবনা তুলনামূলক কম।

এসব ক্ষেত্রে যিনি মৌখিক যৌনাচারে মুখ ব্যবহার করছেন তার সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সম্ভাবনা আরও বাড়ে যদি মুখের আশেপাশে কাটা-ছেড়া কিছু থাকে। মৌখিক যৌনাচার করার আগে দাঁত মাজা, বা জিভ ছোলা, বা দাঁতের ফ্লস ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রয়োজনে মাউথওয়াশ ব্যবহার করা যেতে পারে।

মৌখিক যৌনাচারের মাধ্যমে কোনো যৌনরোগ সংক্রামিত হয়ে থাকলে নির্দ্বিধায় সঙ্গীকে সাথে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যান।

## ১১. কীভাবে নিরাপদ মৌখিক যৌনাচার করা যেতে পারে?

ছেলেদের ওপর মৌখিক যৌনাচার করার আগে কন্ডোম ব্যবহার করা যায়। মেয়েদের ওপর মৌখিক যৌনাচার করার সময় বা পায়ু যৌনাচার করার সময় ফিমেল কন্ডোম ব্যবহার করা যেতে পারে।

## ১২. সঙ্গমের (Penetrative Sex/Intercourse) সময় জননাঙ্গে ব্যথা কী কী কারণে হতে পারে?

সঙ্গমের সময় বা পরে জননাঙ্গে ব্যথা হওয়াকে ডাক্তারি পরিভাষায় Dyspareunia বলা হয়। অন্য কোনো শারীরিক রোগ, জননাঙ্গের সংক্রমণ এমনকী মানসিক সমস্যা থেকেও এটি হতে পারে। এই সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কোনো লজ্জা না রেখে কথা বলুন। আপনার কোনো গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক সমস্যাও থাকতে পারে। যেমন,

মেয়েদের ক্ষেত্রে

১. যৌন সংক্রামিত রোগ, যেমন সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়াসিস, থ্রাশ ইত্যাদি রোগ,

২. রজোনিবৃত্তি (Menopause)-র পর যোনির পিচ্ছিল রস ক্ষরণকারী গ্রন্থির ক্ষরণ কমে যাওয়ার কারণে,

. . . স্বনামধন্য সেক্সোলজিস্ট ডক্টর লোধ বা ডক্টর পিল্লাই বা এরকম কারুর কাছে না দৌড়ে আপনার চেনা ডাক্তারবাবুকে দেখান, সব নির্দ্বিধায় খুলে বলুন।

৩. যথেষ্ট পরিমাণ শারীরিক উত্তেজনা না থাকা সত্ত্বেও সঙ্গম করলে,

৪. যোনিদেশের পেশির অত্যধিক সংকোচনের ফলে (Vaginismus),

৫. স্পার্মিসাইড জেলি, ল্যাটেক্স কন্ডোমে অ্যালার্জি থাকলে, সঙ্গমের সময় যোনিপথে ব্যথা বা জ্বালা হতে পারে।

এছাড়া সঙ্গমের সময় তলপেটের ব্যথা হতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য শ্রোণিদেশের প্রদাহ (Pelvic Inflammatory Disease), এন্ডোমেট্রিওসিস, জরায়ুর ফাইব্রয়েড টিউমার, ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম ইত্যাদি রোগে।

ছেলেদের ক্ষেত্রে

১. লিঙ্গের হার্পিস, থ্রাশ, ওয়ার্ট ইত্যাদি সংক্রমণে,

২. লিঙ্গমুণ্ড যে চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে (foreskin) তাতে বা লিঙ্গমুণ্ডে কোনো ছোটো কাটাছেঁড়া থাকলে যোনির পিচ্ছিল রসে জ্বালা করতে পারে,

৩. লিঙ্গমুণ্ডের চামড়া খুব টাইট হলে তা ফিরে লিঙ্গমুণ্ডের ওপর টেনে নেওয়া যায় না (Paraphimosis), তখন ব্যথা হয়,

৪. প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের সংক্রমণ,

৫. অণ্ডকোষের প্রদাহ, সংক্রমণ বা অণ্ডকোষের সঙ্গে যুক্ত নালী এপিডিডাইমিসের প্রদাহ হয়ে থাকলে এই সমস্যা হতে পারে।

## ১৩. সঙ্গমের সময় ব্যথা হলে কী করবেন?

উপরে বর্ণিত কোনো কারণে সঙ্গমের সময় জননাঙ্গে ব্যথা বা জ্বালা বা সঙ্গমের পর কোনো ঘা, ফোড়া বা জননাঙ্গ থেকে অস্বাভাবিক ক্ষরণ হলে স্বনামধন্য সেক্সোলজিস্ট ডক্টর লোধ বা ডক্টর পিল্লাই বা এরকম কারুর কাছে না দৌড়ে আপনার চেনা ডাক্তারবাবুকে দেখান, সব নির্দ্বিধায় খুলে বলুন, ডাক্তারবাবু জায়গাটা দেখা প্রয়োজন মনে করলে অবশ্যই দেখান। কোনো রোগই গোপন রোগ নয়। আপনার

ছোটোবেলার অবদমিত স্মৃতি ইত্যাদি থেকেও মিলনের সমস্যা হতে পারে। এতে আপনার সঙ্গীরও কোনো দোষ নেই। ডাক্তারবাবুকে সব খুলে বলুন। উনি অবশ্যই আপনার কোনো কথাই অন্য কোনোখানে বলে দেবেন না বা তা নিয়ে হাসাহাসি করবেন না। এটা ওঁর পেশাগত নিয়মের মধ্যে পড়ে।

গোপন করার সুযোগ নিয়ে ভণ্ড 'চিকিৎসক'-এর ভণ্ড চিকিৎসার খপ্পরে পড়বেন না। ভুল চিকিৎসায় সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে আপনার, আপনার সঙ্গীর ও আপনার আশেপাশের মানুষজনেরই ক্ষতি।

## ১৪. ডাক্তারবাবু কী করবেন?

ডাক্তারবাবু যৌন সংক্রমণ সন্দেহ করলে আপনাকে ওষুধ দিতে পারেন বা বেশ কিছু রক্তপরীক্ষা বা জননাঙ্গের ক্ষরণের প্যাথলজি পরীক্ষা করতে দিতে পারেন। যোনির যথেষ্ট পরিমাণ পিচ্ছিলতার অভাবে জ্বালা হলে আপনাকে পিচ্ছিলকারক জেলি ব্যবহার করতে হতে পারে, নিজে থেকে কোনো ক্রিম বা অন্য কিছু লাগাবেন না। কন্ডোম লাগালে কোনো তেল-নির্ভর অয়েন্টমেন্ট লাগানো যাবে না, কারণ ল্যাটেক্স এর সঙ্গে অয়েন্টমেন্টের ফ্যাট জাতীয় পদার্থের বিক্রিয়া হতে পারে। ল্যাটেক্সে অ্যালার্জি থাকলে ডাক্তারবাবু আপনাকে কন্ডোম ছাড়া অন্য কোনো গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা নিতে বলতে পারেন। কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকার পরও যদি সমস্যা থাকে তবে ডাক্তারবাবু আপনাকে সাইকায়াট্রিস্ট বা কাউন্সেলিং-এর জন্য পাঠাতে পারেন। সাইকায়াট্রিস্টের কাছে যেতে বলার কথা শুনে ডাক্তারবাবু

আপনাকে পাগল ঠাউরেছেন ভেবে বসবেন না যেন। সাইকায়াট্রিস্ট ও সাইকোলজিস্টরা মনের আরও হাজার-একটা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। মনে রাখবেন কোনো শারীরিক সমস্যা ছাড়াও টেনশন, মানসিক অবসাদ, ছোটোবেলার কোনো শারীরিক/যৌন অত্যাচারের অবদমিত স্মৃতি ইত্যাদি থেকেও মিলনের সমস্যা হতে পারে। এতে আপনার সঙ্গীরও কোনো দোষ নেই। ডাক্তারবাবুকে সব খুলে বলুন। উনি অবশ্যই আপনার কোনো কথাই অন্য কোনোখানে বলে দেবেন না বা তা নিয়ে হাসাহাসি করবেন না। এটা ওঁর পেশাগত নিয়মের মধ্যে পড়ে।

## ১৫. লিঙ্গ-যোনি সংগম না করলেও কি গর্ভসঞ্চার হতে পারে?

হ্যাঁ। যদিও লিঙ্গ-যোনি সঙ্গম না করলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে, তবে তা একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর জন্যে একটু বুঝে নেওয়া জরুরি গর্ভসঞ্চার কীভাবে হয়।

পুরুষের বীর্যের শুক্রাণু স্ত্রী-দেহের ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হলে নিষেক (Fertilisation) হয়, এই নিষিক্ত ডিম্বাণু জরায়ুতে প্রোথিত (Implanted) হলে তাকে আমরা গর্ভসঞ্চার বলি।

যৌনাচারের সময় অর্গাজমের মুহূর্তে পুরুষের উত্তেজিত লিঙ্গ থেকে বীর্য নির্গত হয় যার মধ্যে প্রায় ৩০ কোটি শুক্রাণু থাকে। এর কোনো একটি শুক্রাণু দিয়ে স্ত্রী-দেহের ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়।

১. অর্গাজমের আগে থেকেই পুরুষের লিঙ্গ থেকে এক ধরনের পিচ্ছিল রস বেরোয় যার মধ্যেও কিছু পরিমাণ শুক্রাণু থাকে। এই শুক্রাণু থেকেও নিষেক হতে পারে। অর্থাৎ অর্গাজমের সময় বীর্য যোনিতে না বেরোলেও শুক্রাণু-ডিম্বাণু মিলন হতে পারে।

২. পুরুষ যদি যোনির খুবই কাছে বীর্য ত্যাগ করে তাহলে সেখান থেকে শুক্রাণু যোনিতে প্রবেশ করতে পারে, যদিও সম্ভাবনা কম।

## সম্পাদকীয় সংযোজন

আমাদের দেশে যৌনতা নিয়ে রাখঢাক খুব বেশি। এতটাই বেশি যে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার ছয় বছর পেরিয়ে গেলেও তাতে কোনো যৌনতা বা যৌন আচরণ নিয়ে লেখা বেরোয়নি। এটা বোধকরি আমাদের সবার ভেতরে থাকা এক স্বয়ং-সেন্সর, যা মনে করে যে যৌনতার সমস্যা ঠিক আর পাঁচটা দেহমনের সমস্যার মতো মান্যতা পায়নি এবং কোনো পত্রিকাতে এ-নিয়ে লেখা প্রকাশ করলে তা রগরগে হয়ে যাবে; কোনো 'সিরিয়াস' পত্রিকার পক্ষে এসব এড়িয়ে চলাই ভালো।

যৌনতার ধারণার মতো যৌন আনন্দেরও ধরন ও প্রকৃতি অসীম বৈচিত্র্যময়। একে একটিমাত্র পদ্ধতি, প্রণালী বা ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে দিয়ে ভাবা নিরর্থক। যৌনতা আমাদের সমাজে নিষিদ্ধ বা প্রকাশ্যে অনালোচ্য টপিক। কিন্তু আমাদের প্রেম ও বিবাহের ধারণার মধ্যেও যৌনতার ধারণা জুড়ে আছে। এছাড়াও আছে ধর্ষণ, শরীরের ওপর অধিকারের ধারণা। যৌনতার ধারণাকে নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে প্রেম, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক বহু প্রতিষ্ঠানের ধারণা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।

দেখা যাক পাঠক কী ভাবেন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর লেখা অনুসরণে বর্তমান লেখাটি বাংলায় লিখেছেন ডা. অপূর্ব, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

**প্রাপ্তিস্থান:**

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফিহাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজস্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজস্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়া হাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ: ই-মেল-utsamanush1980@gmail.com

ফোন-৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

# কিডনিতে জীবাণুসংক্রমণ বা পায়েলোনেফ্রাইটিস

মূত্রথলি থেকে ব্যাকটিরিয়া উঠে এসে একটি বা দু-টি কিডনিকে আক্রমণ করতে পারে, তাতে যে রোগ হয়, তার নাম পায়েলোনেফ্রাইটিস। বেশি হয় সিস্টাইটিস বা মূত্রথলির জীবাণুসংক্রমণ, যাতে মূত্রত্যাগ করতে ব্যথা হয়। সিস্টাইটিসের চেয়ে পায়েলোনেফ্রাইটিস গুরুতর, যদিও সময়ে চিকিৎসা করলে গুরুতর কোনো ক্ষতি হয় না। চিকিৎসা না হলে কিন্তু কিডনির স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যেতে পারে—লিখেছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ।**

জ্বর-জ্বর লাগছে, কাঁপুনি একটু একটু, কোমরের এক পাশে বা দু-পাশেই ব্যথা? হয়তো আপনার কিডনির জীবাণুসংক্রমণ হয়েছে। এ রোগের উপসর্গ অর্থাৎ কষ্টগুলো খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়:

- কোমরের পাশে বা পেছনে, জননাঙ্গের কাছে ব্যথা হয়।
- বেশি জ্বর হয়, তাপমাত্রা ৩৯.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা ১০৩.১ডিগ্রি ফারেনহাইট অবধি উঠতে পারে।
- ঠান্ডা লাগে, কখনো কাঁপুনি দেয়।
- খুব দুর্বল বা ক্লান্ত লাগে।
- খিদে কমে যায়।
- অসুস্থ বোধ হয়।
- পাতলা পায়খানা হতে পারে।

সঙ্গে মূত্রথলির সংক্রমণ সিস্টাইটিস বা মূত্রনালীর সংক্রমণ ইউরেথ্রাইটিস থাকলে:

- মূত্রত্যাগের সময় ব্যথা বা জ্বালা করা।
- বারবার মূত্রত্যাগ করা, প্রস্রাব পেলে ধরে রাখতে না পারা।
- মূত্রত্যাগ করেও যেন মূত্রথলি খালি হল না এমন মনে হওয়া।
- প্রস্রাবে রক্ত যাওয়া।
- ঘোলাটে বা দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব।
- তলপেটে ব্যথা।

শিশুদের কিডনির সংক্রমণে অতিরিক্ত কিছু উপসর্গ থাকতে পারে:

- উদ্যমের অভাব।
- বিরক্তিভাব।
- খেতে না পারা, বমি হওয়া।
- যতটা বাড় হওয়া উচিত, ততটা না বাড়া।
- পেটে ব্যথা।
- জন্ডিস।
- বিছানায় প্রস্রাব করা।

জ্বর আছে, পেটে-কোমরের নীচে বা জননাঙ্গে ব্যথা বা মূত্রত্যাগের ধরনে কোনো পরিবর্তন দেখলে ডাক্তারের কাছে যান। কিডনির অধিকাংশ সংক্রমণেই দ্রুত অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা দরকার যাতে কিডনির ক্ষতি না হয়ে যায় বা রক্তে সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে। জ্বর আর ব্যথা কমানোর জন্য বেদনানাশকেরও দরকার পড়ে।

## কিডনির সংক্রমণের চিকিৎসা

☞ বাড়িতে থেকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ৭ থেকে ১৪ দিন দেওয়া হয়। প্রস্রাবের কালচার-সেন্সিটিভিটি পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। এই পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করার পর সাধারণত সিপ্রোফ্লক্সাসিন দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয়, রিপোর্ট আসার পর প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক বদল করা হয়। তবে মহিলাদের গর্ভাবস্থায় এই ওষুধ দেওয়া হয় না। তাঁদের দেওয়া হয় সেফালেক্সিন।

জ্বর আছে, পেটে-কোমরের নীচে বা জননাঙ্গে ব্যথা বা মূত্রত্যাগের ধরনে কোনো পরিবর্তন দেখলে ডাক্তারের কাছে যান। কিডনির অধিকাংশ সংক্রমণেই দ্রুত অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা দরকার যাতে কিডনির ক্ষতি না হয়ে যায় বা রক্তে সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে।

☞ জ্বর ও ব্যথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামলই নিরাপদ। আইবুপ্রোফেন বা অন্য কোনো অস্টেরয়েড প্রদাহরোধী ওষুধ কিডনির সংক্রমণে ব্যবহার না করাই শ্রেয়, সেগুলোতে কিডনির আরও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

☞ কিডনির সংক্রমণে ওয়েস্টার্ন ধরনের টয়লেট সিটে বসে মূত্রত্যাগের চেষ্টা না করাই ভালো, তাতে মূত্রথলি পুরো খালি না হওয়ার সম্ভাবনা।

☞ জল ও অন্য তরল খেতে হয় বেশি মাত্রায়। তাতে শরীরে জলের

অভাব হতে পারে না আর প্রস্রাবের তোড়ে ব্যাকটিরিয়াও কিডনি থেকে বেরোতে থাকে।

☞ আর দরকার বিশ্রাম। কিডনি সংক্রমণে মোটামুটি ২ সপ্তাহ সময় লাগে কাজে ফেরার মতো সুস্থ হতে।

কিডনির জীবাণুসংক্রমণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার দরকার হয় তখন, যখন রোগীর মূত্রতন্ত্রে কোনো গঠনগত বা অন্য সমস্যা আছে যা থেকে জীবাণুসংক্রমণের ঝুঁকি বেশি।

- ✦ পুরুষদের মধ্যে কিডনির সংক্রমণ খুব কম হয়, তাই তেমন হলে পরীক্ষানিরীক্ষা করে নিতে হয়।
- ✦ মেয়েদের দু-বার বা তার বেশিবার কিডনি সংক্রমণ হলে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হয়।
- ✦ শিশুদের কিডনি সংক্রমণ হলে বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসা করানোই ভালো।

## হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করানোর দরকার:

- ⅄ রোগীর শরীরে জল কমে গেলে।
- ⅄ রোগী যখন জল বা ওষুধ গিলে খেতে পারছেন না।
- ⅄ দ্রুত নাড়ীর গতি, জ্ঞান হারিয়ে যাওয়া—এইসব সেপ্টিসিমিয়ার উপসর্গ থাকে যদি।
- ⅄ গর্ভাবস্থায় তাপমাত্রা যদি খুব বাড়ে।
- ⅄ রোগী যদি আগে থেকেই দুর্বল থেকে থাকেন।
- ⅄ অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি অবস্থার উন্নতি না হয়।
- ⅄ রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি আগে থেকেই কম থাকে।
- ⅄ মূত্রতন্ত্রে যদি পাথর বা ক্যাথিটার থেকে থাকে।
- ⅄ রোগীর যদি ডায়াবেটিস থাকে।
- ⅄ রোগীর বয়স যদি ৬৫ বছরের বেশি হয়।
- ⅄ পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ থেকে যদি কিডনির কার্যক্ষমতা কম থেকে থাকে।

কিডনির সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিরায় ড্রিপ লাগানো হয় যাতে রোগীর জলশূন্যতা না হয় এবং অ্যান্টিবায়োটিক যাতে শিরা দিয়ে দেওয়া যায়। নিয়মিত রক্তপরীক্ষা ও প্রস্রাব পরীক্ষা করে শরীরের অবস্থা দেখা হয়, দেখা হয় অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে কিনা।

বেশিরভাগ রোগী চিকিৎসায় সাড়া দেন। জটিলতা কিছু না থাকলে ৩ থেকে ৭ দিনের মধ্যে তাঁকে ছুটি দিয়ে দেওয়া যায়। ড্রিপ খোলার পর ইঞ্জেকশনের বদলে মুখে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো হয়।

## কিডনির জীবাণুসংক্রমণের জটিলতা

জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি শিশুদের, ৬৫ বছরের বেশি বয়সি রোগীদের, গর্ভবতী মহিলাদের, ডায়াবেটিস মেলিটাস, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ও সিকল সেল অ্যানিমিয়ার রোগীদের, কিডনি প্রতিস্থাপনের পর (বিশেষত প্রথম ৩ মাস), প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এমন রোগীদের, হাসপাতালে থাকাকালীন কিডনির সংক্রমণ হয়েছে এমন রোগীদের। যেসব জটিলতা হতে পারে, সেগুলো এইরকম:

- ⅄ কিডনিতে ফোঁড়া—কিডনির কোষকলার ভেতর পুঁজ জমে। এমনটা বেশি হয় ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগীদের। ফোঁড়া হলে রক্তে জীবাণুসংক্রমণ হয়ে প্রাণসংশয় হতে পারে। ছোটো ফোঁড়া, শিরায় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। বড়ো ফোঁড়া হলে সুচ ফুটিয়ে পুঁজ টেনে বার করতে হয়।
- ⅄ সেপ্সিস বা রক্তে জীবাণু ছড়িয়ে পড়া—প্রাণসংশয় হতে পারে এমনটায়। এক্ষেত্রে আইসিইউ-তে ভর্তি করে চিকিৎসা করাই শ্রেয়।
- ⅄ কিডনির তীব্র সংক্রমণ যাতে কিডনির একটা অংশ নষ্ট হয়ে যায়।
- ⅄ কিডনির বিকলতা—যাতে ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের দরকার হতে পারে।
- ⅄ এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, সময়ের আগে প্রসবযন্ত্রণা ও প্রসব হতে পারে।

কিডনির জীবাণু সংক্রমণের উপসর্গ, চিকিৎসা নিয়ে তো জানলেন। এবার জানা যাক কী কারণে এই সংক্রমণ হয়।

কিডনির সংক্রমণ হয় ব্যাকটিরিয়া মূত্রনালী দিয়ে ঢুকে মূত্রথলি দিয়ে গবিনী (ইউরেটার) হয়ে যখন কিডনিতে পৌঁছায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ব্যাকটিরিয়া হল ই. কোলাই। ই. কোলাই থাকে আমাদের

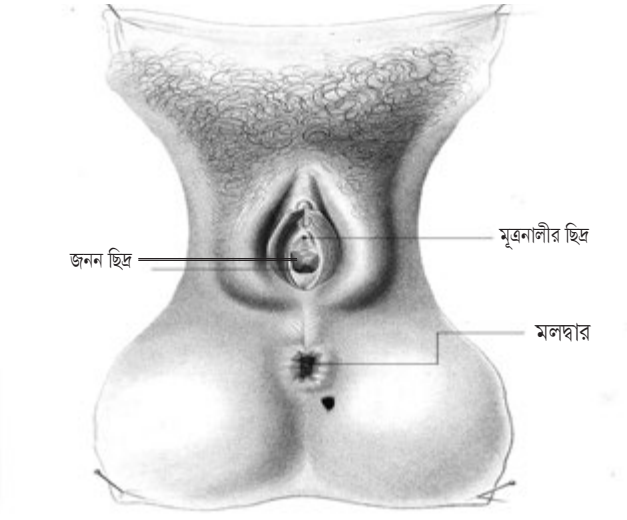


চিত্র ১. মহিলাদের বহিঃ জননাঙ্গ

খাদ্যনালীতে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে শৌচ করার সময় মলদ্বার থেকে এই জীবাণু মূত্রনালীর মুখে এসে পৌঁছোতে পারে। এমনটা হতে পারে যৌনসংসর্গের সময়েও। খুব অল্প কিছু ক্ষেত্রে চামড়ার

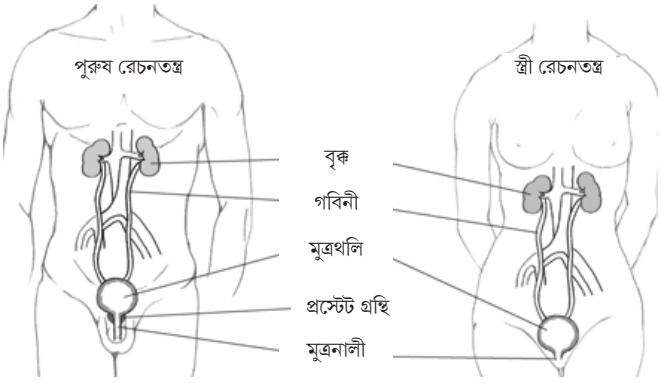


চিত্র ২. পুরুষ ও স্ত্রী রেচনতন্ত্র

ব্যাকটিরিয়া বা ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ থেকে রক্তবাহিত হয়ে জীবাণু কিডনিকে সংক্রামিত করতে পারে—তবে এমনটা হয়, যে সব মানুষের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুব কমজোর, কেবল তাদেরই।

## কাদের কিডনি সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি?

মহিলা ও শিশুদের কিডনি এবং মূত্রতন্ত্রের অন্য সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি।

মহিলাদের মলদ্বার ও মূত্রনালীর ছিদ্র খুব কাছাকাছি, তাই মলদ্বার থেকে হঠাৎ করে মূত্রনালীতে জীবাণু ঢোকার সম্ভাবনা বেশি।

মহিলাদের মূত্রনালী দৈর্ঘ্যেও পুরুষের মূত্রনালীর চেয়ে অনেক ছোটো। পুরুষের মূত্রনালী লিঙ্গের মধ্যে দিয়ে যায়, মহিলাদের তা নয়। তাই মহিলাদের মূত্রথলিতে সহজেই জীবাণু পৌঁছে যেতে পারে। আর তা থেকে উঠতে পারে কিডনিতে।

এছাড়া যেসব ক্ষেত্রে কিডনি সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি সেগুলো হল:

➢ যখন কোনো কারণে মূত্রতন্ত্রের স্বাভাবিক গতিপথ অবরুদ্ধ—কিডনিতে পাথর, প্রস্টেট গ্রন্থি বাড়া।

➢ যেসব শিশুরা কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগে, তাদেরও ঝুঁকি বেশি।

➢ জন্মগতভাবে যদি মূত্রতন্ত্রে কোনো অস্বাভাবিকত্ব থাকে।

➢ এমন অবস্থা যাতে মূত্রথলি পুরো খালি করা যাচ্ছে না, যেমন—মেরুদণ্ডের আঘাত। এতে জীবাণু বংশবৃদ্ধি করার ও ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ বেশি পায়।

➢ রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি কম থাকে, যেমন টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাসে, ক্যান্সারের কেমোথেরাপির পরে।

➢ প্রস্টেট গ্রন্থির সংক্রমণ (prostatitis) থাকলে জীবাণু কিডনিতে ছড়িয়ে যেতে পারে।

➢ যদি মূত্রনালীতে ক্যাথিটার লাগানো থাকে।

➢ মহিলা, যাঁরা যৌনসম্পর্কতে সক্রিয়—কেননা যৌনসম্পর্কের সময় মূত্রনালী উত্তেজিত হয়, তাতে জীবাণু মূত্রথলিতে উঠতে পারে।

➢ পায়ুকামী পুরুষ।

➢ গর্ভবতী মহিলাদের শারীরিক যে পরিবর্তনগুলো হয় তার ফলে প্রস্রাবের গতি শ্লথ হয়ে যায়, তার ফলে জীবাণু কিডনিতে ছড়িয়ে যাওয়া সহজতর হয়।

➢ কোনো কোনো দেশ বা সমাজে মেয়েদের যৌনাঙ্গ কাটা হয়, তাও কিডনির সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায় ।

দেখা যায়:

☞ কিডনি সংক্রমণে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় প্রায় ছয়গুণ বেশি আক্রান্ত হন।

☞ কমবয়সি মহিলারা আক্রান্ত হন বেশি, কেননা তাঁদের যৌন সক্রিয়তা বেশি।

☞ শিশুরা আক্রান্ত হয় যদি তাঁদের মূত্রতন্ত্রে জন্মগত অস্বাভাবিকত্ব থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মূত্রথলি থেকে প্রস্রাব কিডনির দিকে ফিরে যায়, যার ডাক্তারি নাম vesico-ureteric reflux, তাতেও কিডনি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি।

**কিডনির সংক্রমণে ওয়েস্টার্ন ধরনের টয়লেট সিটে বসে মূত্রত্যাগের চেষ্টা না করাই ভালো, তাতে মূত্রথলি পুরো খালি না হওয়ার সম্ভাবনা।**

## কিডনি সংক্রমণ কি ঠেকানো যায়?

কিডনির জীবাণু সংক্রমণ ঠেকাতে জননাঙ্গ, মূত্রনালী ও মূত্রথলিকে জীবাণুমুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হয়:

✦ জল এবং অন্য তরল খেতে হয় বেশি করে।

✦ প্রস্রাব পেলেই তা ধরে না রেখে ত্যাগ করা উচিত।

✦ মলত্যাগের পর শৌচ করার সময় হাত সামনে থেকে পিছনে নিতে হয়, উলটোটা করলে জীবাণু মূত্রনালীতে ঢোকার ঝুঁকি বাড়ে।

✦ রোজ স্নানের সময় এবং যৌন সংসর্গের পর যৌনাঙ্গ ভালো করে পরিষ্কার করতে হয়।

✦ যৌনক্রিয়ার পর মূত্রত্যাগ করে মুত্রথলিকে খালি করতে হয়।

✦ মহিলা হলে পশ্চিমি কেতার টয়লেটে বসে মূত্রত্যাগ না করাই ভালো, কেননা সেই অবস্থানে মূত্রথলি অনেক সময় পুরোটা খালি হয় না।

✦ কোষ্ঠবদ্ধতা এড়াবার জন্য খাদ্যে আঁশের পরিমাণ বাড়াতে হয়, জল বেশি খেতে হয়। প্রয়োজনে মল নরম রাখার ওষুধ খেতে হয়।

✦ যৌনক্রিয়ার সময় কন্ডোম ব্যবহার করলে তা যেন পিচ্ছিল (lubricated) হয়, কন্ডোম পিচ্ছিল না হলে মূত্রনালী বেশি উত্যক্ত হয়। কন্ডোমে যেন শুক্রাণুনাশক (spermicide) না থাকে, কেননা শুক্রাণুনাশক ব্যাকটিরিয়ার বংশবৃদ্ধি বাড়াতে পারে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এম বি বি এস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত যুক্তিসঙ্গত কয়েকটি চিকিৎসাকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত।

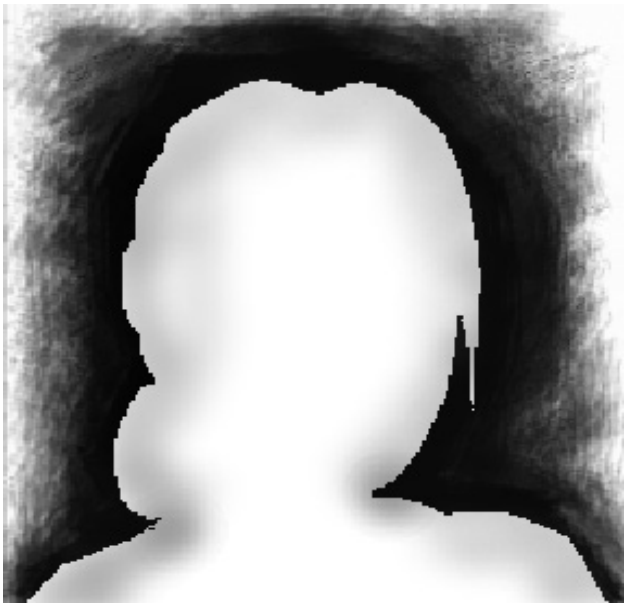

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

## কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

# মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। “সন্দীপ্তাকে মনে রেখে” মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে “মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন”।

# সংগ্রহ করুন

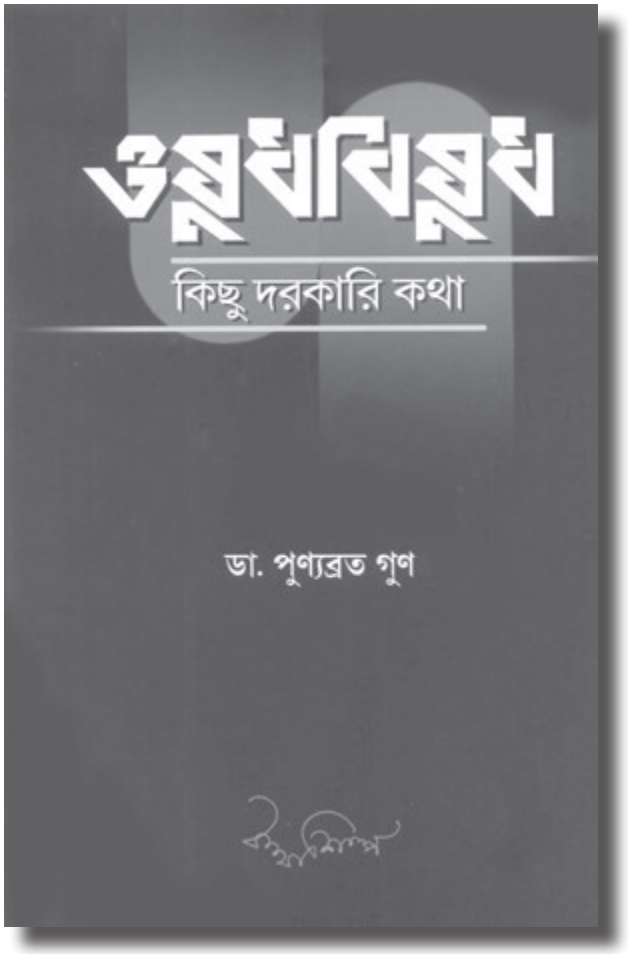


## বিষয়

- মানুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন্য মানুষ
- জেনেরিক নাম
- ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ
- ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান
- অত্যাবশ্যক ওষুধ
- অদরকারি ওষুধ
- মি টু ড্রাগ
- ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের সংগ্রাম

মূল্য ১৫০ টাকা

## বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

# ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

পর্ব: এগারো

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

‘ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে’ পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে,২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে দিনলিপির অনেক-আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

এরপর বোনকে নিয়ে গেলাম রাজমহলে শ্বশুরবাড়িতে। এখন তো আমি হাভাতের দলে, কারোরই আমাকে গায়ে জ্বালা-ধরানো অপমান করতে বাধে না। জীবন যে এমন দুঃসহ বোঝা হয়ে উঠবে তা কি ভেবেছিলাম কোনোদিন! একমুঠো অন্নের জন্যে এত হতচ্ছেদ্দা! আর সইতে পারছিলাম না। এর ওপর ওই ছোট্ট মেয়েটার দায়ও আমার। কোথায় যাব? কী করব?—অহরহ এই উৎকণ্ঠা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। এ জগতে আমার নিজের বলতে কেউ নেই; কেউ নেই যে আমার একটু খেয়াল রাখবে, আমি কিছু খেতে পাচ্ছি কী না সেদিকে নজর রাখবে। ‘তোমাকে যদি আসতেই হয়, আসতে পারো; তবে তুমি চলে গেলে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি বাপু!’ এরকমটাই তখন আমার আত্মীয়কুটুমের মনোভাব! এভাবে কি কেউ বাঁচতে পারে? এর ওপর আছে আমার ছোটো বোন উমার সাত-সতেরো বায়না—কী না—স্বর্ণর ছেলেমেয়েদের যা যা আছে ওকেও তা দিতে হবে। উমার বায়নার পর বায়নার জ্বালায় আমার কান ঝালাপালা। কী করব আমি? ওর বায়নার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে কখনো কড়া ধমক দিতাম, কখনো বা দু-চার ঘা লাগিয়ে দিতাম। পাঁচি আর বুঁচি ওকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে ওর কান্না থামাত। মেজদি অবশ্য আমাদের খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রাখতেন। কিন্তু উমার জন্যে জুতো, দামি দামি জামাকাপড় আমি কোথা থেকে জোগাড় করব? বোনটার জন্যে ভেবে ভেবে উৎকণ্ঠায় রাতে আমার ঘুম হত না। এরপর আমি শালকিয়ায় গেলাম। সেখানে রইলাম কিছুদিন।

খবর পেলাম আট মাস পর ভাই বাড়ি ফিরে এসেছে, সঙ্গে বউকেও ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। ভাবলাম, এবার একবার বাড়ি গেলে হয়। অন্তত আমার গয়নাগাটিগুলো ফেরত পাওয়া গেলেও তো কিছুটা কাজে দেয়। কিন্তু ও আমার গয়না ফেরত দেবে কোথা থেকে? ও তো সবকিছুই বাঁধা দিয়ে রেখেছে।

ওর বউ বাপের বাড়িতে নিজের গয়নাগাটি সব রেখে তবে ফিরে এসেছে। আমি গিয়েছিলাম যদি আমারটা ফেরত পাই এই আশায় আশায়। ওর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে কিছু লাভ হল না; উলটে ও আমাকে বাড়ি থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিল। আমি গিয়ে উঠলাম আমার গুরুর* পরিবারে। কিন্তু শান্তিরামের মা-র (গুরুপত্নী) জন্যে ও-বাড়িতে টিকে থাকা খুব কঠিন। দশ বছরের শান্তিরাম আমার ভাইয়ের মতো। কিন্তু ওর মা আমার বোন আর ছোটো ভাইটাকে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে কিছুতেই আমার কাছে আসতে দেবেন না। এইভাবে কী করে অন্যের বাড়িতে আমি থাকতে পারি! বিশেষ করে শান্তিরামের মায়ের মতো একজনের সঙ্গে?

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একদিন মন স্থির করে ফেললাম;

*বাংলায় অনেক পরিবারে বংশপরম্পরায় কুলগুরু থাকতেন। তিনি পরিবারের সদস্যদের দীক্ষা দিতেন।

চলে গেলাম কাকা যোগেন ঘোষের কাছে, জিগেস করলাম: 'আমাকে বলে দিন, কী করব আমি এখন?' তিনি বললেন: 'আমি কী করতে পারি, বলো বাছা। তোমার ভাই তো আমার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দিয়েছে। আর ও যে বেয়াড়া ধাতের মানুষ, কোন দিন আমাকে খুনও করে ফেলতে পারে। ওরে বাব্বা! না, না এসব ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটে আমি একদম জড়াতে চাই না। তাছাড়া ও তো তোমার ভাই, বিবাদটা ওর সঙ্গে তোমার; আমি কী করতে পারি।' আমি কাকার হেঁশেলের কাছে গিয়ে আমার ভাইয়ের বউকে জোরে জোরে ডাকলাম। সে পুব-দালানের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জিগেস করলাম: 'কী বলল আমার লুটেরা ভাইটি?' সে জবাব দিল: 'আজ তোমার ব্যাপার নিয়ে আমাদের তুমুল একচোট হয়ে গেছে আর ও তো আমাকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলেছে। আমি ওকে বলেছিলাম, "যাও তোমার বোনকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসো; তুমি যা যা করছ মোটেই তা ভালো দেখাচ্ছে না। লোকজন বলাবলি করছে, বিধবা বোনটার যা কিছু ছিল সব কেড়েকুড়ে নিয়ে ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ।" আমার মুখের কথা খসতে-না-খসতেই সপাটে এক চড় কষাল। ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে টেনে

এখন তো আমি হাভাতের দলে, কারোরই আমাকে গায়ে জ্বালা-ধরানো অপমান করতে বাধে না। জীবন যে এমন দুঃসহ বোঝা হয়ে উঠবে তা কি ভেবেছিলাম কোনোদিন! একমুঠো অন্নের জন্যে এত হতচ্ছেদ্দা!

নিয়ে গিয়ে বলল: "বড়ো বড়ো বুকনি ঝাড়িসনি তো; এতশত কথা শোনার আমার দরকার নেই। ফের যদি তোকে বেয়াড়াপনা করতে দেখি তো গলা টিপে মেরে ফেলব।" ঠাকুরঝি, আমায় কোনোদিন কেউ এত বিচ্ছিরিভাবে অপমান করেনি। ওর যা ইচ্ছে হয় করুক। আমি আমার নিজের রাস্তা দেখে নেব। তুমি যদি এখানে থাকতে, তাহলে হয়তো যে করেই হোক থেকে যেতাম। কিন্তু নিত্যরোজ এই অপমান আর গালিগালাজ আমি আর সইতে পারছি না। একদিন সকালে খানিকটা পাঁঠার মাংস আর মাছ নিয়ে এসে আমার ওপর হুকুম জারি করলে: "আমি কয়েকজন ভদ্দরলোককে নেমন্তন্ন করে এসেছি। জলদি যা আর চটপট রান্নাবান্না সেরে ফেল।" আমি তড়িঘড়ি রান্না করে ফেললাম। বেলা তিনটের সময় তিনি এলেন খাবার-দাবার নিয়ে যেতে। ওর ওই আড্ডাখানায় যারা আসে, তারা ভদ্দরলোক! একদল ছেনাল মাগি তাদের সঙ্গে ছিনেজোঁকের মতো লেপটে থাকা কতগুলো লম্পট। আমি আমার বুড়ি-ঝিটাকে পাঠিয়েছিলাম খোঁজ নিতে; সে এসে আমাকে এইসব কথা জানালে। দিনের পর দিন বায়নাক্কা বেড়েই চলেছে। ঠাকুরঝি, এত অনাচার! আমি আর পারছি না।'

আমি বললাম: 'তুমিই-বা কী করবে? বাড়িতে তো তেমন বড়ো কেউ নেই যে ওর রাশ টেনে ধরতে পারে। আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে আমারই টাকায় ও এখন আমোদফুর্তি করে বেড়াচ্ছে। কতদিন আমি এমন ঘর-ছাড়া ভবঘুরের মতো টিকে থাকতে পারব, জানি না। বাবা-মা পরিবারে এমন একটা কুলাঙ্গার রেখে গেলেন—কপাল চাপড়ে আর কী হবে!'

আমরা যখন কথা বলছিলাম, সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। আমি মন্দিরের দিকে রওনা দিলাম। শান্তিরামের মা সেদিন বিকেলে রাঁধেননি। দুই ছেলেকে পান্তাভাত খাইয়ে দিয়ে আমাকে বললেন অন্য কোথাও গিয়ে ভাতের জোগাড় করতে। কোথায় যাব? সেদিন সকালে প্রসন্ন মিত্রকে কয়েক আনা পয়সা দিয়ে আমার জন্যে কিছু চিঁড়ে-বাতাসা আনতে বলেছিলাম। তিনি যখন বিকেলে সেগুলো আমাকে দিতে এলেন জানালেন, আমার ভাইয়ের বউ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

হে ভগবান! কখন কী করে এই কাণ্ডটা ঘটল? এই তো সন্ধ্যে পর্যন্ত ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন: 'দাশ পরিবারের বুড়ি মেয়েমানুষটি এইমাত্র এসে জানালে, বাড়ির গিন্নি ছাদের কড়িবরগা থেকে ঝুলে পড়েছে।' আমি বললাম: 'ভাই, আমাকে একটু নিয়ে যাবে? আমি বাড়ি যেতে চাই।' সে বলল: 'আসুন। আমিও যাব, ওঁর কী দশা, একবার দেখা দরকার।' প্রসন্ন মিত্রর সঙ্গে বাড়ি গেলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, একঘর লোক নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। 'কী বলল? এখনও বেঁচে আছে।' অন্যরা বলল: 'না, না। দেখছ না, প্রাণের কোনো লক্ষণই নেই।' আমি ফোঁপাচ্ছিলাম। যোগেন ঘোষের শালি আর রক্ষিতা একযোগে বলে উঠল: 'চুনি আজ বিকেলে এসেছিল। ওই নিশ্চয়ই বউটাকে মেরেছে।' এরকম কয়েকবার বলার পর কাকা এক কড়া ধমক লাগালেন: 'চুপ কর বেজন্মা! যা খুশি তাই মনে আসলেই ভড়ভড় করে বলে যাবি?' তখন ও আমার খুড়-ঠাকুরদার কাছে গিয়ে বললে: 'সেজদা, আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যাভার করছে কেন?' তিনি বললেন: 'তুই এখানে এসেছিস কেন? যা, বাড়ি যা।' এই বলে তিনি ওকে বের করে দিলেন। ও বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। প্রসন্ন মিত্র আমার মাতাল ভ্রাতৃরত্নটিকে ধরে ধরে নিয়ে আসছিল। যোগেন ঘোষের রক্ষিতা রাস্তায় ভাইকে ধরে বলল: 'তোমার বোন তোমার বউটিকে মেরে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে।' একে মাতাল, তায় এই কথা শুনে ও তো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। প্রসন্ন ওকে অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করলে: 'আরে, আমি তো ওকে এইমাত্র বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলাম।' সঙ্গে সঙ্গে মেয়েছেলেটা বলে উঠল: 'ডাহা মিথ্যে কথা। আমি ওকে বিকেলে দেখেছি। ও ওই ছোটো ঘরটায় লুকিয়েছিল। এইসব লোকের সঙ্গে সড় করে তোমার বোন তোমার এত বড়ো সব্বোনাশটা করল।' মাতাল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল: 'আমি যদি আজই রামদা দিয়ে ওকে দু-টুকরো না করেছি তো আমার নাম দেবী ঘোষ নয়।' ওর কথা শুনে প্রসন্ন মিত্র পুবের বারান্দার দিকের দরজা খুলে দিয়ে আমাকে

ঠেলে দিল, বলল: 'বোন, বাঁচতে চাও তো পালাও। না হলে এক্ষুনি একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবে।' আমি কাকার ঘরে গিয়ে ধপ করে বসে পড়লাম। শুনতে পাচ্ছি, বাইরে মাতালটা চিল্লামিল্লি করে যাচ্ছে। সার কথা এই: আমাকে না মারতে পারলে আর কাকার নাড়িভুড়ি বের করে না নিতে পারা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই। এমন বেলাগাম গালাগালির বহরে ক্ষেপে গিয়ে খুড়-ঠাকুরদা ঠাটিয়ে একটা চড় কষাল, বলল: 'এটা কি তোর মাতলামি করার সময়? হতভাগা বজ্জাত তুই-ই তো বিকেলে বউটাকে ধরে মার লাগাচ্ছিলিস। আমি নিজে দেখেছি। তুই নিজেই যে ওকে খুন করিসনি তার কী প্রমাণ আছে? বোনটার যা কিছু ছিল সব কেড়েকুড়ে নিয়ে এখন ওকে খুন করার মতলব আঁটছিস; যেহেতু ওকে বাঁচাবার কেউ নেই। বল, হারামজাদা কে তোকে এই খবরটা দিল?' আমার ভাই তখন মিনমিন করে বলল: 'বড়ো খুড়িমা আমায় বলেছে।' শোনা মাত্র যোগেন ঘোষের ভাই রাগে গরগর করে গর্জে উঠলেন: 'কোথায় সেই কুলটা হারামজাদিটা? সেজদা, ওকে এখুনি দূর দূর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও; নইলে, এই আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, ও কিন্তু ঘোঁট পাকিয়ে অশান্তি বাড়িয়েই চলবে। আমি ওকে জুতোপেটা করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব।'

'ওঃ! কী যে একটা গেরোয় পড়লাম আমি! আমার বাড়িতে যদি তুই থাকিস তাহলে ওই খুনে-গুণ্ডাটা ঝামেলা পাকাবে; আর যদি তুই নিজের ঘরে ফিরে যাস তাহলে তো তোকে খুনই করে ফেলবে। ওই বজ্জাত মাগিটা ওকে তোর বিরুদ্ধে ফুসলিয়ে ওর মনটা বিষিয়ে দিয়েছে। কিছুতেই তোকে তোর হকের বাড়িতে থাকতে দেবে না।

যোগেন ঘোষ টুঁ শব্দটি করলেন না। করবেনই-বা কী করে? ওঁর বাড়াবাড়ি রকমের আশকারা পেয়েই তো ওঁর মেয়েমানুষটা সবার মাথায় চড়ে বসেছে। আর মেয়েমানুষটা গুণের ঘাট—তলে তলে আমার মাতাল ভাইটার সঙ্গেও সে নটঘট চালিয়ে যাচ্ছিল। আমার সঙ্গেও এই "খুড়ির" ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। ওর কুচ্ছিত ভাষায় ফোড়ন কাটা কথাবার্তা আমি সইতে পারতাম না; ওকে বেশ করে কড়কে দিতাম। সেজন্যেই ভেতরে ভেতরে ও আমার ওপর গভীর বিদ্বেষ পুষে রাখত। এটা ছিল ওর আমার ওপর শোধ তোলার পালা। হেরে গিয়ে ও চুপ মেরে বসে রইল।

প্রচণ্ড হইহট্টগোলের শেষে কিছু-একটা তো ঠিক করতে হবে। ভাইয়ের মারের দাগ বউটির সারা গায়ে। পুলিশকে খবর দিলে আর রক্ষে নেই—একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বে। বলা তো হচ্ছে, বউটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে; কিন্তু এটা তো আসলে একটা খুন। মুরুব্বিরা শলা-পরামর্শ করে ঠিক করলেন—একদিকে ডাক্তারকে খবর দেওয়া হোক, অন্যদিকে মড়াটাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করে বলা হোক; বউটি কলেরায় মারা গিয়েছে। সকলেরই মনে ধরল মতলবটা। কেউ একজন ডাক্তার ডাকতে গেলেন; ওদিকে মড়া নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে। ডাক্তার যতক্ষণে এলেন ততক্ষণে মড়া চিতায় উঠে গেছে; চিতায় আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ছোটোখুড়ো ডাক্তারকে বললেন: 'আপনাকে ডাকতে পাঠালাম আর তখনই ও গেল মরে। কী করব বলুন! দেরি তো আর করা যায় না। যদি মনে করেন, তবে শ্মশানে গিয়ে একবার দেখে আসতে পারেন।' ডা. কে ডি ঘোষ বললেন: 'এখন আর গিয়ে কী হবে?' খুড়ো বললেন: 'আমাদের একটা সার্টিফিকেট দরকার। জানেনই তো আমাদের ভালো কেউ দেখতে পারে না—শত্রুর দল চারপাশে। কোথা থেকে কেউ ফস করে কী একটা বলে বসবে, কেউ জানে না। তখন তা নিয়ে আবার একটা হাঙ্গামা বেধে যাবে।' ডা. ঘোষ বললেন: 'ওসব নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না।' তিনি একটা সার্টিফিকেট দিলেন, তাতে লেখা ছিল: 'মৃত্যুর কারণ কলেরা। আসলে আমিই বউটির চিকিৎসা করতাম।' খুড়ো তাকে একশো টাকা দিলেন। তিনি জিগেস করলেন: 'এত টাকা দিচ্ছেন কেন?' খুড়ো জবাব দিলেন: 'এই রাতে আমাদের জন্যে এত কষ্ট করে এলেন; কিছু বাড়তি তো দিতেই হয়।' ডা. ঘোষ খুশি মনে চলে গেলেন। খুড়ো ভেতরমহলে এসে জানতে চাইলেন: 'তুই কি এখনও এখানে আছিস?' আমি বললাম: 'কোন চুলোয় যাব আমি!' তিনি বললেন: 'ওঃ! কী যে একটা গেরোয় পড়লাম আমি! আমার বাড়িতে যদি তুই থাকিস তাহলে ওই খুনে-গুণ্ডাটা ঝামেলা পাকাবে; আর যদি তুই নিজের ঘরে ফিরে যাস তাহলে তো তোকে খুনই করে ফেলবে। ওই বজ্জাত মাগিটা ওকে তোর বিরুদ্ধে ফুসলিয়ে ওর মনটা বিষিয়ে দিয়েছে। কিছুতেই তোকে তোর হকের বাড়িতে থাকতে দেবে না। ওই দুশ্চরিত্রাকে এড়ানো খুবই কঠিন। ভাইটার তো কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। বাড়িতে একটা নষ্ট মেয়েমানুষ থাকলে যা হয়—একটার পর একটা ঝামেলা লেগেই থাকে। আমার ভাইটি এসব দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না; শুধু বলতে থাকে: "আমার বাচ্চাগুলোকে দেখবে কে?" হুঁ! বাচ্চাদের যত্নআত্তি! তার যে পরাকাষ্ঠা হচ্ছে, সে তো আমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। না খেতে পেয়ে ছেলেমেয়েগুলো রাস্তায় রাস্তায় চরে বেড়াচ্ছে। এসব নেহাতই অছিলা। এক কাজ কর—আজ তুই বরং মহিম দাসের বাড়ি গিয়ে থাক।' আমি জিগেস করলাম: 'এত রাতে কে আমাকে নিয়ে যাবে?' তিনি ত্রৈলোক্যখুড়োকে ডেকে পাঠালেন, বললেন: 'যা তো, ওকে মহিম দাসের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আয়।'

সে রাতে মহিম দাসের বাড়ি গেলাম। সারাদিনে কুটোটাও দাঁতে কাটা হয়নি আর রাতেও দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। শরীরে-মনে পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রইলাম একটা কূলহারা মানুষের মতো। ভাইয়ের কুৎসিত নিষ্ঠুরতা আর আত্মীয়কুটুমদের

আমাকে মানুষই না জ্ঞান করা—এসব আমার ওপর যে ঝড় বইয়ে দিয়েছিল তা যেন আমাকে শেকড়সুদ্ধু উপড়ে ফেলছিল। আমাকে দেখলে সকলেরই যেন ঘেন্নায় গা রি রি করে ওঠে। আমাকে দূর দূর করে খেদিয়ে না দিতে পারলে ওদের যেন রাতে ঘুম আসে না। আর আমার দশাটা বুঝুন—দু-টি অন্নের জন্যে, স্রেফ টিকে থাকার জন্যে আমায় কী-না-কী করতে হচ্ছে। মনে মনে ভাবি: 'জগতে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়কুটুমের থেকে মানুষ কি এরকমটাই আশা করে? ভাইবোনেদের আদর-যত্নে-স্নেহে বড়ো করে তোলার এই কী প্রতিফল? কিন্তু কেন ওদের কারও আমাকে নিয়ে এক কণাও দুর্ভাবনা নেই? তাহলে আমিই বা ওদের পরোয়া করব কেন? ভগবান যখন আমাকে বিপদ সাগরে ছুঁড়ে ফেলেছেন, আমি ওই বিপদকেই মাথায় তুলে নেব। আমি আর এখানে থাকব না। কপালে যা থাকে হবে। এখানে কিছুতেই আর এক মুহূর্তও থাকব না।'

এইসব ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে দেখলাম, আমাকে ঘিরে ও-বাড়ির মেয়ে-বউরা সব দাঁড়িয়ে। ওরা জেনেছে, আমার ভাইয়ের বউ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। যেমন হয়—পাড়াপড়শির কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিতে আশপাশের মানুষজনের অশ্লীল আমোদ করার ইচ্ছে জেগে ওঠে—এদেরও হয়েছে তাই। আমাকে জিগেস করতে লাগল—কীভাবে বউটা গলায় দড়ি দিল? কেন দিল? এরকম আরও শতেক প্রশ্ন। তখন আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছিল; মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। তার ওপর এমন বোকা বোকা গায়ে জ্বালা ধরানো প্রশ্ন। মনে হচ্ছিল, আমার সারা গায়ে যেন সুঁচ ফুটছে। মহিম দাস এসময় এসে বললেন: 'তোমরা সকলে হামলে পড়ে ওকে জ্বালিয়ে মারছ কেন? ও কী করে জানবে, ওর ভাইয়ের বউ কেন গলায় দড়ি দিয়েছে। যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে, কখন কীভাবে গলায় দড়ি দেবে সে কি কাউকে জানিয়ে যায়—যাতে মানুষজন জানতে পারে ঠিক ঠিক কী ঘটেছে? গতকাল থেকে ওর মুখে একদানা অন্নও পড়েনি; তা নিয়ে তোমাদের একটুও মাথাব্যথা নেই। অথচ নির্বোধের মতো প্রশ্ন করে ওকে জ্বালিয়ে মারছ! চলে যাও সব এখান থেকে। ও স্নান করে নিক, তারপর ওকে কিছু খেতে-টেতে দাও।'

তারপর মহিম দাসের মা আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। কলসিতে করে জল এনে দিলেন, যাতে আমি ঘরেই চান করে নিতে পারি। এরপর তিনি একটা নারকেল ভেঙে কুঁড়িয়ে আমাকে মুড়ি-বাতাসা আর নারকেল-কোঁড়া দিয়ে খেতে দিলেন। খেয়ে-দেয়ে জল খেয়ে আমি শরীরে যেন একটু জোর পেলাম। মহিম দাসের মা-কে আমি জেঠিমা ডাকতাম। জেঠিমা আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন: 'বাছা, এই ঘরে তুমি নিশ্চিন্তে শোও, এখানে কেউ তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে আসবে না। কপালে তোমার দুর্ভোগ লেখা, কী আর করবে বলো? না হলে অত বড়ো একজন নামি মানুষের মেয়ে তুমি, কে ভেবেছিল ওরা আজ তোমাকে এই ধুলোয় টেনে নামাবে! দেখা যাক, তোমার ছোটো খুড়শ্বশুর কী করতে পারে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক প্রাবন্ধিক ও অভিধানকার।

Advt.

মিডিয়া কবলমুক্ত, তথ্যনিষ্ঠ বিশ্ব-বিশ্লেষণের ত্রৈমাসিক সম্ভার

বাংলা মান্থলি রিভিউ

স্বাধীন মার্কসবাদ-চর্চার অনন্য পত্রিকা

যোগাযোগ: বই-চিত্র, কলেজ স্ট্রিট, কফিহাউস (তৃতীয় তল), কলকাতা ৭০০০৭৩

মুঠোফোন: ৯৪৭৭৪৩৩৩৫২
৯৮৩০৮৪৭১৫৯

# ডেন্টাল অ্যাবসেস বা দাঁতের ‘ফোঁড়া’

দাঁতের ‘ফোঁড়া’ (ডেন্টাল অ্যাবসেস) হল দাঁতের ভিতরে মাড়ীতে বা চোয়ালের হাড়ে জমা পুঁজ। এই যন্ত্রণাদায়ক রোগটিতে অনেকে ভুগেছেন। কী করবেন ডেন্টাল অ্যাবসেস হলে? শুধু আপনার নয়, ব্রিটেনের মানুষজনের দাঁতের রোগ নিয়ে ভারি চিন্তা, তাই ও দেশের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস ইন্টারনেটে ডেন্টাল অ্যাবসেস নিয়ে খুব সুন্দর লিখেছে। সব কথা অবশ্য আমাদের দেশে খাটে না। তাই ইন্টারনেট থেকে কাজের কথাগুলো নিয়ে বাংলায় সহজ করে লিখেছেন **ডা. কুশল সেন**।

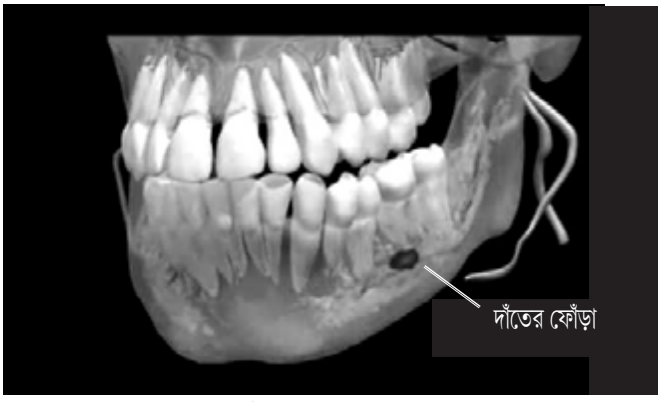


চিত্র ১. দাঁতের ফোঁড়া

## আচ্ছা, দাঁতে পোকা লাগে নাকি?

না, সত্যি সত্যি পোকা লাগা যাকে বলে, সেটা দাঁতে হয় না। যা হয় তা হল আপনার দাঁতের মধ্যে বা মাড়ীতে ব্যাকটিরিয়া অর্থাৎ জীবাণুর সংক্রমণ।

দাঁতে দৃশ্যমান অংশে সংক্রমণ হলে দাঁতের ডাক্তাররা সাধারণত বলেন, কেরিজ হয়েছে। আর যখন দাঁতের শক্ত অংশের পাশে বা নীচে সংক্রমণ হয় ও পুঁজ হয়, ডাক্তাররা বলেন, ডেন্টাল অ্যাবসেস। এর দুটো ধরন—পেরিএপিকাল অ্যাবসেস আর পেরিওডোন্টাল অ্যাবসেস। কেরিজ নিয়ে ঢের কথা আপনারা শুনেছেন। দাঁতে ব্যথা হলেই লোকে বলে দাঁতে পোকা, আর সেটা আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হল কেরিজ। ভালো বাংলায় বলে দন্তক্ষয়। ওটা হল দাঁতের যে অংশটা দেখা যায়, তার রোগ। সেখানে জীবাণু বাসা বাঁধে আর ক্ষইয়ে দেয় দাঁতকে। কিন্তু দাঁতের আশেপাশে আছে মাড়ী, দাঁতের তলায় আছে হাড়—সেগুলোও কখনো-সখনো জীবাণুর আক্রমণের সামনে পড়ে, আর রোগ হয়। সেগুলোর প্রধান হল ডেন্টাল অ্যাবসেস। সেটা নিয়ে মানুষের তেমন জানা নেই।

## পেরিএপিকাল অ্যাবসেস আর দাঁতের পেরিওডোন্টাল অ্যাবসেস

দাঁতের চেহারাটা অনেকটা হিমশৈলের মতো। না, বরফ দিয়ে তৈরি দাঁত, তা নয়, মানে ওই খানিক ডুবে থাকার ব্যাপারে হিমশৈল। হিমশৈল যেমন, অধিকাংশটাই ডুবে থাকে আর একটুখানি দেখা যায়, সেরকম। অবশ্য হিমশৈলের মতন অতটা ডুবে থাকে না দাঁত। তবু,

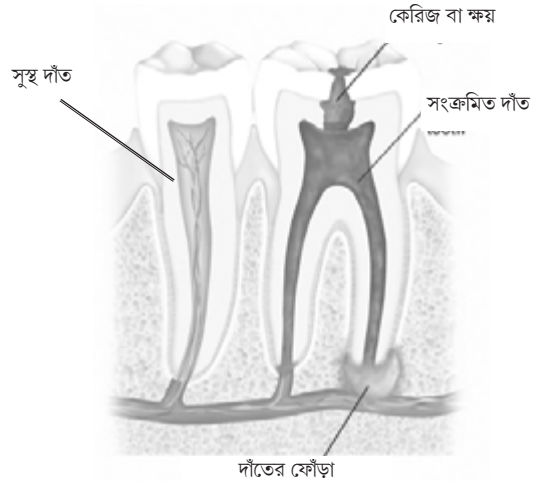


চিত্র ২. পেরিএপিকাল অ্যাবসেস

মাড়ীর ওপরে যে সাদা অংশটা, সেটাকেই আমরা দাঁত বলি বটে, কিন্তু দাঁতের ডাক্তার জানেন, মাড়ী দিয়ে ঢাকা পড়ে থাকে দাঁতের অনেকটাই। বেশি বয়সে মাড়ী অনেক সময় বেশ সরে বা ক্ষয়ে যায়, তখন দেখা যায় দাঁত কিন্তু অনেকটা নীচ পর্যন্ত আছে। সেটা হাড়ের মধ্যে বেশ খানিকটা গেঁথে আছে। না থাকলে চলবে কেন? সারা জীবনে কত শক্ত জিনিস চিবোতে হয়, তাই দাঁত, বিশেষ করে তার ওপরের সাদা অংশ এনামেল, ভারী শক্ত জিনিস। আর সেই শক্ত জিনিসটা যাতে কামড় দিতে দিতে নড়বড়ে না হয়ে যায় সে জন্য সেটা খুব জোরসে মাটিতে পুঁতে রাখা, ঠিক যেমন গাছ মাটির নীচে শেকড় চালিয়ে কাণ্ডটাকে ধরে রাখে যাতে ঝড়ে পড়ে না যায়। দাঁত অবশ্য ঠিক মাটিতে পোঁতা থাকে না। মুখগহ্বরের ওপর আর নীচে যে দুটো হাড় আছে (ম্যান্ডিবল আর ম্যাক্সিলা, তবে এসব নাম মনে রাখার দরকার নেই), তার মধ্যে গর্তে টাইট করে দাঁতের গোড়া পোঁতা থাকে। ওপর দিকে যেমন দাঁতের চূড়া আছে, নীচের দিকে তেমনই দাঁতের নীচের চূড়া আছে। সেখানে সেই

চূড়ার আশেপাশে গিয়ে জীবাণু আক্রমণ করে, বাসা বাঁধে, বংশবৃদ্ধি করে। সেটাকেই বলে পেরিএপিকাল অ্যাবসেস বা দাঁতের নীচের ডগার ফোঁড়া। আর দাঁতের যেটুকু দেখা যায় তার নীচে মাঢ়ীর তলায় হওয়া ফোঁড়াকে বলে পেরিওডোন্টাল অ্যাবসেস।

## কী দেখে চিনবেন দাঁতের ফোঁড়া?

দাঁতের ফোঁড়া বেশিরভাগ সময়ই বেদনাদায়ক হয়, কিন্তু বেদনাহীন ফোঁড়াও হতে পারে। তবে এই দাঁতের ফোঁড়া যেমনই হোক না কেন, দন্তরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

দাঁতের ফোঁড়া যেহেতু এমনি সেরে যায় না, ফলত যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ফোঁড়ার পুঁজ শরীরের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে সংক্রমণ করতে পারে।

**লক্ষণ:**

দাঁতের বা মাঢ়ীর ফোঁড়ার লক্ষণগুলো হল—

১. হঠাৎ করে শুরু হওয়া দপদপে ব্যথা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যথার তীব্রতা বাড়তে পারে।

২. ক্ষতিগ্রস্ত দাঁত বা মাঢ়ীর দিকের কান, ঘাড়, চোয়ালে ব্যথা হতে পারে।

৩. অনেক সময় শোবার সময় ব্যথার প্রকোপ বেড়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

৪. মুখ ফুলে যাওয়া বা লালচে ভাব দেখা দিতে পারে।

৫. বেদনাযুক্ত লালচে নড়বড়ে দাঁত।

৬. চকচকে লাল ফোলা মাঢ়ী।

বেশি গরম বা বেশি ঠান্ডা খাবার না খাওয়া। সাধারণ তাপমাত্রার নরম খাবার, সম্ভব হলে মুখের অন্যদিক দিয়ে চিবিয়ে, খাওয়া। দাঁত মাজার নরম ব্রাশের ব্যবহার, ক্ষতিগ্রস্ত দিকে কুলকুচি এড়িয়ে চলা ইত্যাদি।

৭. বেশি গরম ও ঠান্ডা খাবারে দাঁত শিরশির করা।

৮. দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস এবং/অথবা মুখে বিস্বাদ।

সংক্রমণ শরীরের অন্যত্র ছড়ালে জ্বর আসতে পারে, অসুস্থ বোধ হতে পারে। রোগের তীব্রতা বাড়লে মুখ খুলতে, খাবার গিলতে কিংবা শ্বাস নিতে অসুবিধা হতে পারে।

## দাঁতের ফোঁড়া হলে কী করবেন?

দাঁতের ফোঁড়া হলে একজন দন্তরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। সাধারণ চিকিৎসক আপনাকে এ বিষয়ে খুব একটা সাহায্য করতে পারবেন না।

**কষ্টের উপশম:**

যতক্ষণ না আপনি দন্তরোগবিশেষজ্ঞের কাছে যাচ্ছেন, বেদনানাশকের সাহায্য নিতে পারেন। আইবুপ্রোফেন এক্ষেত্রে সবথেকে ভালো কাজ দেয়, তবে যদি আপনার আইবুপ্রোফেন খাওয়া বারণ থাকে তবে প্যারাসিটামল ব্যবহার করতে পারেন। ১৬ বছরের নীচের শিশুদের অ্যাস্পিরিন না দেওয়াই ভালো।

একটা ব্যথার ওষুধে কাজ না হলে প্যারাসিটামল ও আইবুপ্রোফেন মিশিয়ে নির্দিষ্ট মাত্রায় খাওয়া যেতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এটা মোটামুটি নিরাপদ হলেও ১৬ বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এরকম মিশিয়ে ওষুধ না খাওয়াই ভালো।

এছাড়াও—

ক. বেশি গরম বা বেশি ঠান্ডা খাবার না খাওয়া।

খ. সাধারণ তাপমাত্রার নরম খাবার, সম্ভব হলে মুখের অন্যদিক দিয়ে চিবিয়ে, খাওয়া।

গ. দাঁত মাজার নরম ব্রাশের ব্যবহার, ক্ষতিগ্রস্ত দিকে কুলকুচি এড়িয়ে চলা ইত্যাদি।

—এসব আপনার ব্যথাকে সাময়িকভাবে কম রাখতে সাহায্য করবে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এগুলো করলে আপনি দেরি করে দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন। ডাক্তারের কাছে যেতে দেরি করবেন

দাঁতের ফোঁড়া যেহেতু এমনি সেরে যায় না, ফলত যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ফোঁড়ার পুঁজ শরীরের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে সংক্রমণ করতে পারে।

না, ওপরে লেখা উপায় আপনাকে সাময়িক স্বস্তি দেয় মাত্র, রোগ সারায় না।

## চিকিৎসা

সংক্রমণের উৎসকে সারিয়ে ফেলা আর ফোঁড়া থেকে পুঁজ বের করে দেওয়াই এর একমাত্র চিকিৎসা।

রোগের তীব্রতা আর কোথায় ফোঁড়া হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত চিকিৎসাগুলো করানো যেতে পারে।

১. দাঁত তোলা: যদি রুট ক্যানাল চিকিৎসা সম্ভব না হয় তাহলে দাঁত তুলে ফেলা যেতে পারে।

২. রুট ক্যানাল চিকিৎসা: এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে ক্ষতিগ্রস্ত দাঁতের গোড়া থেকে ফোঁড়া বার করে দাঁতের ভিতরটা ভরাট করে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৩. কেটে পুঁজ বের করা (ইনিসিশন অ্যান্ড ড্রেনেজ): ক্ষতিগ্রস্ত দাঁতের গোড়া বা মাঢ়ীতে ফোঁড়াটার উপরটা হালকা চিরে (ইনসিশন) পুঁজ বার করে দেওয়া হয়(ড্রেনেজ)।

সাধারণত শুধু অপারেশনের জায়গাটা অবশ করেই (লোকাল অ্যানিস্থিসিয়া) এই চিকিৎসাগুলো করা হয়ে থাকে। তবে বড়ো ধরনের অপারেশনের ক্ষেত্রে অজ্ঞান করেও (জেনারেল অ্যানিস্থিসিয়া) করতে হতে পারে।

অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণত ব্যবহার করা হয় না, তবে যদি সংক্রমণ বড়ো ধরনের হয়ে থাকে তবে অ্যান্টিবায়োটিক লাগতে পারে।

## কী থেকে দাঁতের ফোঁড়া হতে পারে?

আমাদের মুখগহ্বর জীবাণুময়। কিছু জীবাণু দাঁতের উপর একটা আস্তরণ ফেলে। একে প্লাক বলে। যদি আমরা দাঁত পরিষ্কার না রাখি,

**দিনে অন্তত একবার ফ্লস বা ইন্টারডেন্টাল ব্রাশ ব্যবহার করে দাঁতের ফাঁকগুলো আর দাঁত ও মাড়ীর সংযোগস্থল পরিষ্কার রাখা। শর্করা ও স্টার্চ যুক্ত খাবার ও পানীয় সেবন কমিয়ে ফেলা।**

ওই প্লাকে থাকা জীবাণুগুলোর ক্ষরিত অ্যাসিড, দাঁত ও মাড়ীর ক্ষতি সাধন করে, যার থেকে দাঁত ক্ষয়ে যায় অথবা মাড়ীর রোগ হয়।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আমাদের দাঁতের ফোঁড়া হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

১. দাঁত পরিষ্কার না রাখা: দাঁত ঠিকমতো ঘষে মেজে পরিষ্কার না রাখলে প্লাক জমে।

২. প্রচুর পরিমাণে শর্করা ও স্টার্চ জাতীয় খাদ্য ও পানীয় সেবন করা: এতে দাঁতে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, দাঁত ক্ষয়ে গিয়ে ফোঁড়া হতে পারে।

৩. দাঁতের আঘাত বা পুরোনো কোনো শল্যচিকিৎসা: জীবাণুরা দুর্বল দাঁতে সহজে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

৪. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে: ডায়াবেটিস, এইডস, যারা স্টেরয়েড ওষুধ খান অথবা যাদের ক্যান্সারের কেমোথেরাপি চলছে।

এসব কারণগুলোর এক বা একাধিক কারণ থাকলে দাঁতের ফোঁড়া বিষয়ে সাবধান থাকুন ও আরও ভালোভাবে দাঁতের যত্ন নিন।

## দাঁতের ফোঁড়া প্রতিরোধে কী করবেন?

দাঁত ও মাড়ী সুস্থ রেখে আমরা দাঁতের ফোঁড়া হওয়া আটকাতে পারি। দাঁত ও মাড়ী সুস্থ রাখতে নীচের বিষয়গুলি অভ্যাসে পরিণত করতে হবে —

ক. দিনে অন্তত একবার ফ্লস বা ইন্টারডেন্টাল ব্রাশ ব্যবহার করে দাঁতের ফাঁকগুলো আর দাঁত ও মাড়ীর সংযোগস্থল পরিষ্কার রাখা।

খ. ফ্লুরাইড যুক্ত মাজন দিয়ে দিনে অন্তত দু-বার দাঁত মাজা। (এটা ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের উপদেশ, তবে ফ্লুরাইড নিয়ে অন্য কিছু সমস্যা আছে)।

গ. দাঁত ব্রাশের পর জল বা মাউথওয়াশ দিয়ে মুখ কুলকুচি না করা, কারণ তাতে উপকারি মাজন দাঁতের উপর থেকে সরে যাবে, শুধু অতিরিক্ত মাজন থু করে ফেলে দিতে হবে।

ঘ. শর্করা ও স্টার্চ যুক্ত খাবার ও পানীয় সেবন কমিয়ে ফেলা।

ঙ. দন্তরোগবিশেষজ্ঞের নিয়মিত পরামর্শ নেওয়া। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

মূল লেখাটি ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর ওয়েবসাইট http://www.nhs.uk/Conditions/Dental-abscess/Pages/Introduction.aspx?url=Pages/What-is-it.aspx থেকে ৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে সংগৃহীত । এটি বাংলায় ভাষান্তর করে ও দেশোপযোগী করে পুনর্লিখন করেছেন ডা. কুশল সেন, এমবিবিএস। তিনি একটি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

Advt.

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে--রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

পত্রিকার দাম ২০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ২০০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে: পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০০৯

ফোন-৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

# বিরক্তিকর অ্যালার্জি

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরেও বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা যায়। তার মধ্যে অ্যালার্জি অন্যতম। অনেক মানুষই কমবেশি এই সমস্যায় ভোগেন— লিখছেন **ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই**।

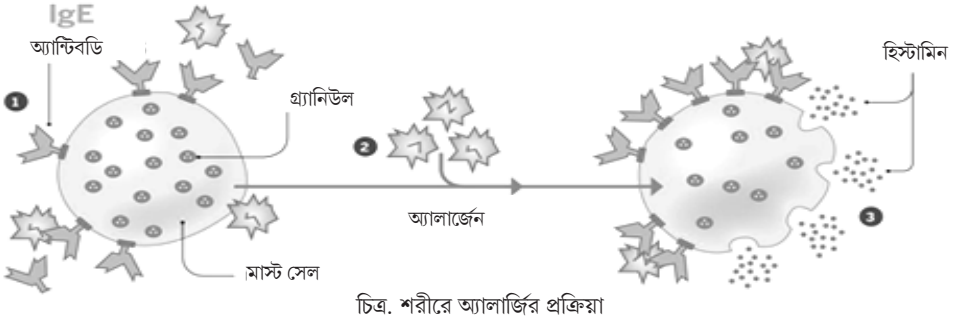


চিত্র. শরীরে অ্যালার্জির প্রক্রিয়া

অ্যালার্জি বলতে সাধারণ মানুষ বোঝেন, কোনো বাইরের জিনিসে হাঁচি, শ্বাসকষ্ট, আমবাত, চুলকানি ইত্যাদি। তবে অন্য কয়েকভাবেও অ্যালার্জির লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। অ্যালার্জি কেন হয় বা কীসের জন্য হয়, তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। কিছু জৈব পদার্থ বা রাসায়নিক পদার্থ কোনো-না-কোনো পথ দিয়ে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নানারকম জটিল বিক্রিয়া ঘটায়। এই পদার্থগুলিকে বলা হয় অ্যালার্জেন। তারই ফলে কিছু বিশেষ উপসর্গ মানবদেহে লক্ষিত হয়। আর এ-ধরনের উপসর্গগুলিকেই সাধারণ ভাষায় অ্যালার্জি বলা হয়। এই উপসর্গগুলির মধ্যে যেমন হাঁচি-কাশি, গায়ে গুঁড়িগুঁড়ি ঘামাচির মতো র‍্যাশ হয়, তেমনই চুলকানি, চামড়ার কোনো অংশ লাল হয়ে ফুলে ওঠা ইত্যাদি অনেক কিছুই হতে পারে।

শুষ্ক আবহাওয়ায় প্রচুর ধুলোবালি বাতাসে ওড়ে। আর এই ধুলিকণাতেই মিশে থাকে ভাইরাস ও অন্যান্য রোগজীবাণু। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই জীবাণুও শরীরে ঢুকে পড়ে। এই অবস্থায় কোনো ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরে দেখা যায়। তবে ঋতু পরিবর্তনের সময় অনেক কারণে অ্যালার্জি হতে পারে। যেমন ফুলের রেণু, ঘাস ইত্যাদি থেকেও শরীরে অ্যালার্জি দেখা দিতে পারে যেকোনো সময়ে। ঘরের কাছে ফুল বা পাতাবাহারি গাছ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন জিনিস থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে তা নির্ধারণ করা কঠিন কাজ। সাধারণত ফাল্গুন মাসের ধুলোময় পরিবেশে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার অনেক কারণ, অ্যালার্জি তার অন্যতম। ধুলো থেকে ডাস্ট অ্যালার্জি যেকোনো সময়ে হতে পারে। কারণ যাই হোক না কেন, ডাক্তার দেখিয়ে সঠিক পরামর্শ নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শরীরে অ্যালার্জির প্রকাশ ঘটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন কারণে। যেমন, কারও হাঁচি বা কাশি হয়, কারও-বা নাক চুলকোতে শুরু করে, নাক দিয়ে অনবরত জল গড়ায়। কারও-বা হাত চুলকোতে শুরু করে। অন্য কারও একসঙ্গে সবই হয়। সাধারণত নাকের অ্যালার্জিকে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়। এইসময় নাক থেকে অনবরত জল গড়াতেও পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির খুব হাঁচি হয়। ফুলের পরাগ রেণু, পুরোনো ধুলোবালি, ঘরের ঝুল, পশুপাখির লোম ইত্যাদি অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের উৎস। অনেক সময় এর ফলে গলায় ব্যথা হয় ও শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটে। আবার অনেক সময় নিশ্বাসের সঙ্গে দুর্গন্ধ বের হয়, নাক দিয়ে শব্দ হয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয় ও ফলে দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। শরীরের অন্য অঙ্গের অ্যালার্জিজনিত সমস্যার সঙ্গে অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের সম্পর্ক থাকতে পারে। সচরাচর যে অন্য রোগগুলির সঙ্গে অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের যে সম্পর্ক আছে সেগুলির ভিতর কনজাংটিভার প্রদাহ, ফ্যারিংসের প্রদাহ, **সাইনুসাইটিস**, একজিমা, হাঁপানি, কর্ণপ্রদাহ ইত্যাদি রয়েছে। এগুলির মধ্যে আবার সবথেকে জটিল হচ্ছে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এবং ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার ভিতরে থাকা সম্পর্ক। এই রোগের ইতিহাস সম্পর্কে খুব ভালো করে জেনেবুঝে তবেই ডাক্তার চিকিৎসা শুরু করেন।

যে সকল জৈব অথবা রাসায়নিক পদার্থ শরীরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পথে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে থাকে, তাদের বলা হয় অ্যালার্জেন। এই রোগসৃষ্টিকারী অ্যালার্জেনগুলি সঠিকভাবে শনাক্ত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, অ্যালার্জেনগুলি থেকে যথাসম্ভব নিজেকে দূরে রাখা উচিত। এদের সংস্পর্শে একদমই আসা যাবে না। ঋতু পরিবর্তনের সময়, বিশেষ করে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাতাসে বেশি পরিমাণে ধুলোবালি ওড়ে। যদিও বাতাসের মধ্যে ধুলো উড়ে বেড়ায় ও আবহাওয়া শুষ্ক হয়, তা সত্ত্বেও কিন্তু এগুলি বায়ুমণ্ডলের বেশি উপরে যায় না। তার ফলে ধুলোবালি সহজেই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে। এই ধূলিকণায় থাকে ভাইরাস তথা

বিভিন্ন রোগের জীবাণু। সেগুলি মানবদেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করলে নাকের প্রতিরোধী ক্ষমতা বহুলাংশে কমে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হওয়ার নেপথ্যে মুলত দায়ী ধুলোয় থাকা 'মাইট' নামের প্রাণীটি। এটি অতি ক্ষুদ্র, খালি চোখে দেখা যায় না। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে 'মাইট' নামক এক ক্ষুদ্র কীটের দেহনিঃসৃত নানা জিনিস মানুষের শরীরে প্রবেশ করার জন্য এক উপযুক্ত পরিবেশ পায়। ধুলোজনিত অ্যালার্জি শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধার সৃষ্টি করে, ফলে ফুসফুসে কম অক্সিজেন সরবরাহ হয় এবং শ্বাসকষ্ট হয়। শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগীরা রাতে ও ভোরের দিকে বেশি কষ্ট পায়। তবে সব শ্বাসকষ্ট মানেই কিন্তু হাঁপানি নয়। শুষ্ক আবহাওয়ায় সাইনাসের অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তিরও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। এছাড়া শ্বসন যন্ত্রের অন্য কোনো প্রতিবন্ধক রোগের জন্যও এমনটা হতে পারে। ছোটোদের ক্ষেত্রে এটি খুব চিন্তাজনক হয়ে দেখা দেয় অনেক সময়। স্কুলে যাতায়াত করার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ধুলোবালি ঢুকে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। যাদের ঘন ঘন এই সমস্যা হয়, তাদের মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। প্রধানত ঋতু পরিবর্তনের সময় দু-টি কারণে শ্বাসের কষ্ট হতে পারে। একটি হল ধুলোবালি আর অন্যটি হল তাপমাত্রার হেরফের। আমাদের শরীরের উত্তাপ এবং পরিবেশের উত্তাপ এক না হলে, শরীর তা সহজে গ্রহণ করতে পারে না। তার ফলে সর্দি-জ্বর ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা বাড়ে।

## কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা

শুষ্ক আবহাওয়ায় যেহেতু চারিদিকে ধুলোময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাই বাইরে ঘোরাফেরা করার সময় সতর্ক থাকা উচিত। বিশেষ করে যারা বাইক বা স্কুটার চালান, তাঁদের মুখে মাস্ক পরিধান করা উচিত। কেননা, মাস্ক পরলে মুখ ঢাকা থাকে। এতে ধুলোবালি সহজে ঢুকতে পারে না।

সাইনাসের রোগীদের জন্য এই সময়টা নিরাপদ নয়। কেননা, শুষ্ক আবহাওয়ায় নাকের ভিতরের ঝিল্লি আরও শুকিয়ে যায়। অনেক সময় নাক দিয়ে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনাও থাকে। এই রকম হলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নাকের ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যায় আক্রান্তদের বিশেষত ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমায় ভোগা রোগীদের জন্যও ধুলোময় পরিবেশ অস্বস্তির কারণ। কেননা, যতই ধুলোবালি শ্বাসনালীতে প্রবেশ করবে, অ্যালার্জির প্রকোপ ততই বৃদ্ধি পাবে। আর এই অ্যালার্জিতে হাঁপানির সম্ভাবনা থাকে। তাই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সাবধানে থাকুন।

যে কারণে অ্যালার্জি হয় সেই কারণগুলি অবশ্যই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

তামাক খাবেন না।

এই সময় যেখানে-সেখানে জল খাবেন না। পারলে জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে খান। প্রচুর পরিমাণে জল খান। নিয়মিত শাকসবজি ও মরসুমি ফল খান। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অসিত রঞ্জন গোসাই, এমবিবিএস, ডিপিএইচ, ডিজিএম। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। চিকিৎসাধিকারিক, কলিকাতা পুরসভা। প্রাক্তন স্বাস্থ্য আধিকারিক, জনস্বাস্থ্য বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

Advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

**কলকাতায়**

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুক মার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, বই-চিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),

বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

# এগোরাফোবিয়া

ডা. সুমিত দাশ

যুবভারতীতে তখন আন্ডার সেভেনটিন বিশ্বকাপ নিয়ে বেশ হইচই চলছে। ভাবছিলাম একদিন খেলা দেখতে যাব কিনা। এরকম সময়ে একটা সাতাশ-আঠাশ বছরের ছেলে এল চেম্বারে দেখাতে। চুলটুল উশকোখুশকো, বলল, 'ডাক্তারবাবু খুব ভয় লাগছে।' জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? বলল, 'জামাইবাবু টিকিট দিয়েছে উদ্বোধনী ম্যাচটা মাঠে গিয়ে দেখার জন্য। তারপর থেকেই ভয়ে হাত-পা কাঁপছে, পেট গুড়গুড় করছে। মাঠে অত লোকের মাঝে কী করে বসে থাকব, ভাবতেই বুক ধড়ফড় করছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কী করব?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, টিকিটটা আমাকে দিয়ে দে। ও বলল, 'আগে জানলে টিকিটটা নিয়ে আসতাম, এখন তো সঙ্গে নেই।' আমি বললাম, 'দরকার নেই। দেখি তোকে মাঠে পাঠানো যায় কিনা!'

এই ছেলেটা এগোরাফোবিয়া (Agoraphobia) রোগে ভুগছে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সেইসব জায়গায় যেতে চায় না, যেখান থেকে হঠাৎ কিছু হলে সহজে পালিয়ে আসা যায় না। এরা প্রকৃত রোগের থেকেও কল্পিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয়টা বেশি পায়।

এই এগোরাফোবিয়া রোগের সহগামী হিসাবে প্যানিক ডিসঅর্ডার (Panic Disorder) বা 'অতি-আতঙ্ক রোগ' নামে একটি রোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্গে থাকে। তাই প্যানিক ডিসঅর্ডার (Panic Disorder) বিষয়টা একটু দেখে নেওয়া যাক। প্যানিক আক্রান্ত রোগীর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ খুব ভয় লাগতে শুরু করে। বুক ধড়ফড়, সারা দেহে কাঁপুনি, শ্বাসকষ্ট, অতিরিক্ত ঘাম, বুকে চাপ লাগা, মাথা ঘোরা, সারা দেহ অবশ হয়ে যাওয়া হতে থাকে। এটা কয়েক মিনিট থেকে আধঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে, অবশ্য তার কাছে মনে হয় যেন অনন্তকাল। ভালো করে পরীক্ষা করেও কোনো শারীরিক রোগ পাওয়া যায় না। আর এই রোগের ভয়েই তারা বাড়ি ছেড়ে দূরে যেতে চায় না। এই করেই পরবর্তীকালে তাদের এগোরাফোবিয়া তৈরি হয়। তবে অনেকের প্যানিক ডিসঅর্ডার ছাড়াই বিশুদ্ধ এগোরাফোবিয়াও থাকে।

## কী উপসর্গ হয়

এগোরাফোবিয়া বড়ো বিচিত্র রোগ। আক্রান্ত ব্যক্তিটি সাধারণভাবে গণপরিবহণ মাধ্যম অর্থাৎ বাস, ট্রেন, প্লেন এড়িয়ে চলে। তারা বড়ো খালি জায়গায় যেতে পারে না, যেমন—পার্ক, শপিং মল বা বাজার। আর ছোট্ট বদ্ধ জায়গাতেও যেতে পারে না—যেমন লিফট, সিনেমা হল। কেউ কেউ লম্বা লাইনে দাঁড়াতে পারে না। সকলের সব উপসর্গ থাকবে—এরকম নয়। তবে যেহেতু বেশি জনসমাগম হয়েছে বা হতে পারে এমন এলাকা, বা খুব খালি এলাকায় তারা যেতে ভয় পায়, তাই বাড়ির বাইরে বেরোতে গেলে সাধারণত কোনো একজন সঙ্গী তারা খোঁজে। অনেক বিবাহিত পুরুষ স্ত্রীকে না নিয়ে বাইরে বেরোতে পারেন না বা উলটোটা। যার জন্য অনেক সময় এই ধরনের পুরুষ বা স্ত্রীলোক ভুল করে সন্দেহবাতিক রোগাক্রান্ত বলেও ডায়াগনোসিস হয়ে যান। রোগ যখন চরম অবস্থায় পৌঁছে যায়, আক্রান্ত মানুষটি প্রায় গৃহবন্দি হয়ে যান। যেহেতু প্যানিক অ্যাটাক বা অতি-আতঙ্ক (অত্যাতঙ্ক) রোগের কারণেই সাধারণত এগোরাফোবিয়া হয়, তাই অত্যাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা করলে এই রোগে আক্রান্ত মানুষও ভালো হয়ে যান। তবে যাদের বিশুদ্ধ এগোরাফোবিয়া রোগ হয়, তারা অনেক ক্ষেত্রেই অবসাদ রোগে ভোগেন বা মদে আসক্ত হয়ে পড়েন। এদের চিকিৎসা খুব কঠিন।

## চিকিৎসা

দু-ভাবে হয়। প্রথমত ওষুধ দিয়ে—বেনজোডায়াজেপিন এবং অবসাদরোধী SSRI বা ট্রাইসাইক্লিক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা। এছাড়া আছে মনশ্চিকিৎসা—বিভিন্নভাবে হয়। কগ্‌নেটিভ বিহেভিয়র থেরাপি সাপোর্টিভ থেরাপি। আর একটা থেরাপিকে বলে ভার্চুয়াল থেরাপি। এখানে কম্পিউটার প্রোগ্রামে রুগীকে খোলা বা ভিড় জায়গাতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতে তার যে উদ্‌বেগ হয় সেটাকে কন্ট্রোল করতে শেখানো হয়। এভাবে তার সমস্যার সমাধান করা হয়।

এগারোফোবিয়া রোগটা প্রকৃতপক্ষে একধরনের উদ্‌বেগ রোগ। সঠিক চিকিৎসাতে ভালোই ফল পাওয়া যায়। তাই হতাশ হওয়ার কিছু নেই, রোগাক্রান্ত হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

# মানসিক চাপ ও উদ্‌বেগ

আজকাল ‘স্ট্রেস’ (Stress) অর্থাৎ ‘মানসিক চাপ’ খুব বেড়েছে এমন কথা আমরা প্রায়ই শুনি। বিশেষত অনেক শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে এমনটা বলেন বিশেষজ্ঞরা যে ‘স্ট্রেস’ থেকেই শারীরিক সমস্যাগুলির উৎপত্তি। এই ‘স্ট্রেস’ আসলে কী? মানসিক চাপ আর মানসিক উদ্‌বেগ—দুই কি একই জিনিস? কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে মানসিক চাপ ও উদ্‌বেগ?— এসব নিয়েই এবারের নিবন্ধ—লিখেছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য।**

## মানসিক চাপ ও উদ্‌বেগ

এক ঝলকে বিচার করলে মানসিক চাপ ও উদ্‌বেগের (Mental Stress and Anxiety) মধ্যে বিশেষ কোনো তফাত নেই। দুটোই নেতিবাচক (Negative) অভিজ্ঞতা। সেই কারণেই অনেক সময় তাদের মধ্যের সূক্ষ্ম পার্থক্যকে অবজ্ঞা করা হয় এবং মানসিক চাপ ও উদ্‌বেগকে সমার্থক বলে মনে করা হয়। মানসিক চাপ ও উদ্‌বেগের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পারলে সমস্যা বর্ধিত আকার ধারণ করতে পারে এবং সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব হয়ে ওঠে না। ‘স্ট্রেস’ সচরাচর সাময়িক অথচ উদ্‌বেগ অনেক ক্ষেত্রেই সময়ের নিরিখে দীর্ঘায়িত ও দীর্ঘস্থায়ী মানসিক সমস্যায় পরিণত হতে পারে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—একজন মানুষ একটা প্রোজেক্টর কাজ করতে গিয়ে চাপ অনুভব করছে, কাজটি হয়তো সে সময়মতো জমা করতে পারবে না। হয়তো সময় কম, কাজ বেশি। পরিস্থিতির দাবি অনেক বেশি। মানুষটি মনে করছে সেই তুলনায় তার উপাচার (resources) কম। তখন সে মানসিক চাপ অনুভব করতে পারে। আর উদ্‌বেগ হল একটা ভয় ভয় অনুভূতি, ভবিষ্যতে কী হবে—(খারাপই হবে) এমন চিন্তার থেকে শারীরিক কিছু উপসর্গ (Symptoms) সৃষ্টি হওয়া। মানসিক চাপ অনেক ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল এবং ব্যক্তি সুচারুভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারলে চাপ হ্রাস পায়। অন্যদিকে উদ্‌বেগ ব্যক্তির আচরণজনিত অভ্যাস। মানসিক চাপের ফল হিসাবে উদ্‌বেগ তৈরি হতে পারে। কাজ সময়ে শেষ হতে পারবে না তাহলে চাকরি রক্ষা করা মুশকিল হতে পারে এমন চিন্তা থেকে উদ্‌বেগ (Anxiety) তৈরি হতে পারে। যার ফলে বুক ধড়ফড় করা, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, গলা শুকিয়ে যাওয়া, পেটের মধ্যে গুড় গুড় করা, ব্লাড সুগার লেভেল বেড়ে যাওয়া, ঘুম ও খিদে কমে যাওয়া—এমন সব শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়। এসব উপসর্গ মানসিক উদ্‌বেগের লক্ষণ।

## মানসিক চাপ (Psychological Stress) কী?

একটা পরিস্থিতি (Situation) যখন বিপজ্জনক বলে মনে হয় তখন আমাদের শরীরে কিছু স্টেরয়েড হরমোন নিঃসৃত হয় যা আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যও

**আজকের জীবনশৈলী (Life Style) আমাদের বাধ্য করছে কম সময়ে অনেক কাজ করার জন্য। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনেক কিছু দাবি করে। সেই অবস্থায় যদি নেতিবাচক মনোভাব কাটিয়ে উঠে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিস্থিতিগুলির মূল্যায়ন করা যায় তাহলে মানসিক চাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হবে।**

প্রস্তুত করে। আমাদের হৃদ্‌স্পন্দন বাড়ে, ব্লাড সুগার লেভেল বাড়ে, পাচনতন্ত্র (Digestive System) সাময়িকভাবে কাজ করা বন্ধ করে, উত্তেজনার মাত্রা বাড়ে। মস্তিষ্ক দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে (Fight) না পরিস্থিতির থেকে পালিয়ে গিয়ে (Flight) এর মোকাবিলা করা যাবে। এমনটা জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। যেমন—বেড়ালকে বিরক্ত করলে দেখা যায় তার শরীর

উত্তেজনায় টান টান হয়ে যায়, চোখের মণি স্ফীত হয়, গায়ের লোম ফুলে ওঠে, নখ থাবার থেকে বেরিয়ে পড়ে। এই শারীরিক প্রতিক্রিয়া বেড়ালকে বিপদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করে। এক্ষেত্রে, বেড়ালটি আক্রমণাত্মক হতে পারে বা পালিয়ে যেতে পারে। মোদ্দা কথা হল পরিস্থিতি বিপদজনক মনে হলে শারীরিক প্রতিক্রিয়া বা প্রস্তুতি হল স্ট্রেসের নির্ধারক। তাহলে দেখা যাচ্ছে স্ট্রেস বা চাপ বলতে যা বোঝায় তা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি। ব্যাপারটা একদম ঠিক। আসলে স্ট্রেস প্রাকৃতিক একটি প্রক্রিয়া যা জীবের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। ভাবুন, আপনি যে ঘরে বসে আছেন সেখানে হঠাৎ করে আগুন লাগল। আর পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য

**ভুললে চলবে না শরীর (Body) ও মন (Mind) ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই এমন ভাবার কোনো কারণ নেই মানসিক অসুখ এক গভীর লজ্জার বিষয়।**

আপনার কোনো স্ট্রেস অর্থাৎ মানসিক ও শারীরিক চাপ হল না। নাহ্, আর বেশি দূর ভেবে কাজ নেই, তাহলে আপনি মানসিক উদ্‌বেগের শিকার হতে পারেন। কিন্তু ব্যাপারটা এত সরল থাকে না। স্ট্রেস যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, ঘন ঘন মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং ঘন ঘন স্টেরয়েড হরমোন নিঃসৃত হয় তবে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়। গ্যাস্ট্রিক আলসার, ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার ইত্যাদি হতে পারে। হার্টের অসুখ দেখা দিতে পারে। এমনকী আর্থ্রাইটিসের মতো বেদনাদায়ক অসুখের মূল কারণ হিসাবে স্ট্রেসকেই দায়ী করা হয়। দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেস উদ্‌বেগজনিত মানসিক রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

## তবে কি ঘন ঘন মানসিক চাপ অনুভব করা একটি অভ্যাস?

এবার দেখে নেওয়া যাক, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে আর তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিনা?

ঘরে আগুন লাগা—এই পরিস্থিতি আমাদের সবার কাছেই বিপদজনক এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধরুন অফিসের বস্ ডেকে একটা নতুন কাজ ধরিয়ে দিল। যা হয়তো আপনার জন্য নির্ধারিত কাজের থেকে একটু আলাদা। একজন এই পরিস্থিতিকে বিপদ বা অসহনীয় মনে করতে পারে। সে ভাবতে পারে বস্ ইচ্ছা করে তাকে নাকাল করার জন্য এমনটা করছে। লোকটা চায় না তার উন্নতি হোক। আর একজন এই বিশেষ কাজটিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখল। সে ভাবল নতুন কাজের অভিজ্ঞতায় সে সমৃদ্ধ হতে পারবে। বস্ তাকে সেই বিশেষ সুযোগ দিচ্ছে। লক্ষ করুন একই পরিস্থিতির কেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে এবং তার ওপর নির্ভর করতে পারে পরিস্থিতি মানসিক চাপ সৃষ্টি করবে কিনা। এই চিন্তাভাবনার ধরন আসলে অনেকটাই অভ্যাসজনিত। পরিস্থিতির নেতিবাচক মূল্যায়ন একটা অভ্যাস এবং সেই অভ্যাস গড়ে উঠলে ঘন ঘন মানসিক চাপ অনুভূত হবে। দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেস বয়ে নিয়ে আসবে রোগব্যাধি। আজকের জীবনশৈলী (Life Style) আমাদের বাধ্য করছে কম সময়ে অনেক কাজ করার জন্য। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনেক কিছু দাবি করে। সেই অবস্থায় যদি নেতিবাচক মনোভাব কাটিয়ে উঠে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিস্থিতিগুলির মূল্যায়ন করা যায় তাহলে মানসিক চাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হবে। 'Stress' কাটানোর জন্য নেশার বস্তু আঁকড়ে না ধরে মন খুলে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটান। ভালো বই পড়ুন, নিয়মিত ঘাম ঝরিয়ে এক্সারসাইজ করুন। এতে শরীরের 'স্ট্রেস টলারেন্স' বাড়বে।

## মানসিক উদ্‌বেগ ও তার প্রতিকার

মানসিক উদ্‌বেগ (anxiety) দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপের ফল হতে পারে। মানসিক উদ্‌বেগের শিকার হলে নিম্নলিখিত উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

১. ভয় ভয় করা।
২. ঘুম কমে যাওয়া।
৩. অস্থির ভাব।
৪. হাত পা ঝিন্ ঝিন্ করা।
৫. দুর্বলতা।
৬. দম বন্ধ হয়ে আসার অনুভূতি।
৭. বুক ধড়ফড় করা।
৮. মুখ ও গলা শুকিয়ে যাওয়া।
৯. বমি ভাব।
১০. পেশিতে টান পড়া।

এইসব উপসর্গ দেখা দিলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। মানসিক উদ্‌বেগজনিত উপসর্গগুলি মোটামুটি এক হলেও DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual- 5) অনুযায়ী নয়টি মানসিক রোগকে উদ্‌বেগজনিত রোগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সঠিক রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করলে 'মানসিক উদ্‌বেগ' নামক অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ, সুন্দর স্বাভাবিক জীবন কাটানো সম্ভব। পরিশেষে, ভুললে চলবে না শরীর (Body) ও মন (Mind) ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই এমন ভাবার কোনো কারণ নেই মানসিক অসুখ এক গভীর লজ্জার বিষয়। তাই মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে যাওয়া মানে সমাজ জীবনে এক ধাপ নীচে নেমে পড়া, হীন হয়ে যাওয়া—ভিত্তিহীন। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে অনেক শারীরিক রোগব্যাধির মূল হল মানসিক অসুস্থতা। আসুন সচেতন হই, সচেতনতা গড়ে তুলি। সুস্থ সমাজ গড়ে তুলি। 'স্বচ্ছ মানসিকতা'ই হোক আমাদের মিশন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক একজন সাইকোলজিস্ট।

# বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও তার প্রশিক্ষণ

স্বাতী মুখার্জ্জী ঘোষাল

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রথমেই যে কথাটি মনে এল সেটা একজন শিশুর প্রথম পরিচয় সে শিশু এবং দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক এবং RTE (Right to Education) Act অনুসারে শিক্ষা প্রতিটি শিশুর অধিকার। আর এই শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে কিছু শিশু বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। আজ সেই সমস্যাগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো শিক্ষা বা এডুকেশন বলতে আমরা শুধুমাত্র পড়াশোনা বা Academic দিকটিকেই বুঝি। কিন্তু শিক্ষা এবং পড়াশোনা দু-টি সমার্থক শব্দ নয়। এডুকেশন বা শিক্ষার একটা বিভাগ (Domain) হল Academic শিক্ষা। শিক্ষার অনেকগুলি বিভাগ

একজন শিশুর প্রথম পরিচয় সে শিশু এবং দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক এবং RTE (Right to Education Act) অনুসারে শিক্ষা প্রতিটি শিশুর অধিকার।

আছে, যেমন—ব্যক্তিগত নৈপুণ্য (Personal Skill), সামাজিক দক্ষতা (Social Skill), পড়াশোনাগত দক্ষতা (Academic Skill) এবং বিনোদনমূলক দক্ষতা (Recreation Skill) ইত্যাদি। এই সমস্ত দক্ষতাগুলি নিয়েই একটি শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ হয়।

যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয় বিশেষ চাহিদা-সম্পন্ন শিশুদের সমস্যা, তাই সেই বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করতে গেলে 'বিশেষ শিক্ষা' (Special Education) বিষয়টি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। প্রশ্ন হল, 'বিশেষ শিক্ষা' কী? এর সরাসরি জবাব দেবার আগে বরং বলি, কে বিশেষ শিক্ষা দেন, ও কীভাবে সেই শিক্ষাদানের পদ্ধতি ঠিক হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষাগ্রহণ করতে গিয়ে যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে হয় সেই সমস্ত সমস্যা কাটানোর উপায় নিয়ে যে পাঠক্রম তৈরি হয় তাকে বলা হয় বিশেষ শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ (Course of Special Education)। আর যাঁরা প্রশিক্ষিত হন তাদের বলা হয় 'বিশেষ প্রশিক্ষক' (Special Educator)। রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (Rehabilitation Council of India, RCI) থেকে 'বিশেষ প্রশিক্ষক'-দের একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেওয়া হয়। 'বিশেষ প্রশিক্ষক'-দের কাজ শিশুদের মনোবিকাশের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা এবং সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিশুর বিকাশ এবং শিক্ষা দু-টির মধ্যে যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। উদাহরণ—একজন মা এসে আমাকে জানালেন তার বাচ্চা একদম রং করতে বা লিখতে আগ্রহী নয়। তখন তাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল আমাদের পরিভাষায় বাচ্চাটির সূক্ষ্ম অঙ্গচালনা ক্ষমতা বিকাশ (Fine Motor Development)-এ সমস্যা রয়েছে। সে তখনও তিনটি আঙুলের সাহায্যে জিনিস ঠিকমতো ধরতে (Tripod Grasp) শেখেনি। আমরা অনেক মা-বাবা, এমনকী অনেক শিক্ষককেও বলতে শুনি—পড়াশোনায় মন নেই, চঞ্চল, কথা শোনে না বা কথা বলে না। এঁরা পরিশেষে নিজেরাই সিদ্ধান্তে আসেন যে সবই বাচ্চার বদমায়েশি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভেবে দেখা প্রয়োজন বাচ্চাটির শিখতে কোনো বিশেষ সমস্যা হচ্ছে না তো?

সমস্যা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে যেমন—শারীরিক কোনো সমস্যা, বুদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যা, মানসিক সুস্থতা সংক্রান্ত সমস্যা,

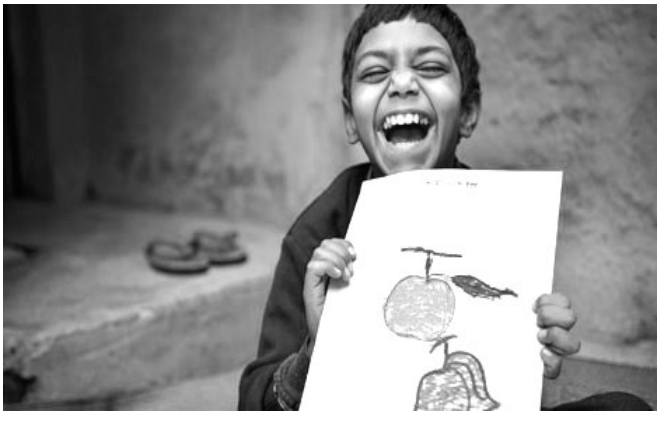

আবেগজনিত সমস্যা, দৃষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি। আর একটি জিনিসের ব্যাপারে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সচেতন থাকতে হবে—শিশুটির বয়স অনুযায়ী বিকাশ (Age Appropriate Development) হচ্ছে কিনা? এর ওপরই নির্ভর করবে তার ভবিষ্যৎ। বয়স অনুযায়ী বিকাশ মানে কী? মানে হল, শিশুর ঘাড় শক্ত হওয়া, উঠে বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, চলা, আওয়াজ হলে সে দিকে তাকানো, তাকিয়ে কথা বলা—এসবগুলো ঠিক সময়ে শিখছে কিনা বা করছে কিনা। একটি দু-টি শেখার ক্ষেত্রে একটু আগে-পরে হতে পারে কিন্তু প্রতিটি ধাপেই যদি দেরি হয় অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে। বোঝার জন্য শিশুর বিকাশের মাইলফলকগুলো (Developmental Milestone) নীচে দেওয়া হল।

কোন বয়সে কী শিখবে—

| বয়স | শেখা |
|---|---|
| ১-৩ মাস | চিনতে পেরে হাসবে। |
| ১ মাস ১৫ দিন-৩ মাস | উড়ন্ত জিনিসে দৃষ্টি স্থির করবে। |
| ৩-৬ মাস | ঘাড় শক্ত হবে শব্দের দিকে। |
| ৬-১০ মাস | উলটে যাবে। |
| ৪-৮ মাস | খেলনা এক হাত থেকে অন্য হাতে নেবে। |
| ৬-১১ মাস | উঠে বসতে পারবে। |
| ৮-১২ মাস | ছোটো জিনিস খুঁটিয়ে দেখবে। |
| ৭-১২ মাস | হাততালি দিয়ে খেলতে শিখবে। |
| ৯-১৭ মাস | হাত ধরে হাঁটবে। |
| ১৮-২৪ মাস | নিজে হাঁটবে। |

**কথাবলা**

| বয়স | আচরণ |
|---|---|
| ২-৩ মাস | আওয়াজ হলে চমকাবে, আওয়াজের দিকে ঘুরবে। |
| ৩-৪ মাস | স্বাভাবিক গলায় কান্না, আদর করলে কান্না থামা। |
| ৫-৬ মাস | বা-বা-বা-/ মা-মা-মা ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ করবে। |
| ৬-১১ মাস | বাবা, দাদা, ইত্যাদি বলবে। |
| ১২ মাস | মানে বুঝে একটা দুটো কথা বলবে। |
| ১৮ মাস | ৫-২০ টা শব্দ শিখে যাবে। |
| ২৪ মাস | শব্দ জুড়ে মনের ভাব জানাবে বা বোঝাবে। |

অনেক মা-বাবা, এমনকী অনেক শিক্ষককেও বলতে শুনি—পড়াশোনায় মন নেই, চঞ্চল, কথা শোনে না বা কথা বলে না। নিজেরাই সিদ্ধান্তে আসেন যে সবই বাচ্চার বদমায়েশি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভেবে দেখা প্রয়োজন বাচ্চাটির শিখতে কোনো বিশেষ সমস্যা হচ্ছে না তো?

সমস্ত মা-বাবা ও শিক্ষকের দায়িত্ব হল, শিশুর বিকাশের স্তরগুলো ও তার যথাযথ সময় সম্পর্কে জানা ও শিশু বিকাশ ঠিক না হলে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞদের কাছে যাওয়া। প্রয়োজনে বিশেষ শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণের কথা ভাবতে হবে, আর বিশেষ প্রশিক্ষকের কাছে যেতেও হবে।

বিশেষ প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আরও বলার ইচ্ছে রইল পরবর্তী কোনো লেখায়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক দু-টি সংস্থার শিশু মনোবিকাশ বিভাগের সঙ্গে Special Educator হিসাবে যুক্ত।

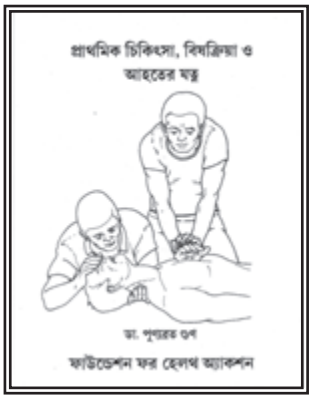

Advt.

# অশোকনগরে কালাচ সাপ ও ফেসবুক গর্জন

**দীপক চক্রবর্তী**

## শুরুর কথা

শিরোনামটা এমন দেখে কেউ অবাক হবেন না। সম্প্রতি অশোকনগর জুড়ে চলছে কালাচ সাপের রাজত্ব। কালাচ বা কালাজ সাপের নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কম, কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া বা শঙ্খচূড় যেভাবে আমাদের জানা বিষাক্ত সাপ, কালাচের তত নামডাক নেই। কিন্তু এই সাপটা অন্য নামকরা সাপের চাইতে বেশি মারাত্মক বিষ ধারণ করে। কালাচের চেহারাটা তেমন ভীতিপ্রদ নয়, সাপের কামড়ের জায়গায় তেমন ক্ষত হয় না, অনেক সময় বোঝাই যায় না সাপে কামড়েছে। সাপটিকে দেখা না গেলে, শরীরে রোগলক্ষণ যখন বোঝা যায় তখন এর বিষের ক্রিয়া অনেকদূর এগিয়ে গেছে। অনেক ডাক্তারই সামান্য 'পোকা' কামড়ের ইতিহাসটুকুর গুরুত্ব বুঝতে পারেন না, অন্য কোনো রোগ ভেবে এর চিকিৎসা করেন। এভিএস, অর্থাৎ সাপের বিষের মূল প্রতিষেধক দেওয়া হয় না, রোগী মারা যান।

অশোকনগরে বিভিন্ন ওয়ার্ডেই এই সাপটির প্রচুর হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। আমি অশোকনগরের বাসিন্দা, আর এখানেই আমি মানুষের জন্য কাজই বলুন আর বিজ্ঞান আন্দোলনই বলুন, যথাসাধ্য করে থাকি। সাপে কাটা মানুষকে ওঝা-গুণিনদের হাতে মরতে না দেওয়া, তাঁদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া, হাসপাতালে তাদের রোগ শনাক্তকরণে ও যথাযথ চিকিৎসায় সাহায্য করা—এসব আমি আমার সামাজিক কর্তব্য হিসেবে করে থাকি।

এতদিন ভাবতাম কেবল গ্রামেই বুঝি কালাচের প্রতিপত্তি, এখন দেখছি শহরেও এর প্রভাব মারাত্মক। কয়েক দিন ধরেই অল্প অল্প করেই এই বিষয়টি নিয়ে বর্তমান লেখাটি লিখতে শুরু করি। তার ওপর মাস দুয়েক আগে ফেসবুকে দেখলাম সাপ কামড়ের চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও তুমুল বাকযুদ্ধ। অবাক কাণ্ড, প্রতিপক্ষ দুই শিবিরেই আমাদের সাপ নিয়ে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টার দুই অপরিহার্য সৈনিক—ডাক্তার আর বিজ্ঞানকর্মী। দু-দলেই আমার বন্ধু, আমার কাজের সহকর্মীরা রয়েছেন। তাই এই লেখাটির প্রথম খসড়া আমি কিছুদিন আগে ফেসবুকে পোস্ট করি। এখন লিখছি স্বাস্থ্য পত্রিকায়, কেননা এই ধরনের তর্কবিতর্ক থেকে তিক্ততা অনেকদিন থেকে যায়, তাই বিতর্ক থেকে কী শিখলাম, সেটা আর কেউ তেমন লিখে প্রচার করেন না। আমি আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় সেইটাই করার চেষ্টা করছি। তাই শিরোনামে কালাচ সাপ আর ফেসবুক।

## সাপের কামড় নিয়ে কতটা কাজ হয়েছে?

ভারত সরকার ২০০৫ সালে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তির নিকট-আত্মীয়দের এককালীন অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়। ২০০৬ সালে এই এককালীন অনুদানের পরিমাণ ছিল কুড়ি হাজার টাকা, আর ২০০৮ সালে এই অনুদানের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে এক লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে যুক্তিবাদী সমিতির অশোকনগর শাখার সহযোগিতায় তিন জন সাপের কামড়ের মৃত পরিবার এই অনুদান পেয়েছেন।

আমার মনে হয় এই অনুদান-সহ প্রকল্পটার একটা মূল উদ্দেশ্য ছিল সাপের কামড়ের একটি সুনির্দিষ্ট জেলাভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার তৈরি, আর সমস্ত মানুষের কাছে সাপের কামড়ের বিপদ ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার কথা পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি এই আইনটি এখনও অনেক মানুষ জানেন না। ফলে জেলাভিত্তিক সঠিক ক্ষতিপূরণের পরিসংখ্যানের বড়ো অভাব। রেজিস্টার বুক হেল্পলাইন ও JSSC বলে একটি ব্যাপার আছে, যাতে কোথায় কতজন সাপের কামড়ের জন্য ফোন করে সাহায্য চেয়েছেন তার পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। এই পরিসংখ্যান বলছে, আমাদের জেলা উত্তর ২৪ পরগনায় ২০১০ সালে ১৬ জন সাপের কামড় খান, আর এর মধ্যে বিষধর সাপে কামড়ের সংখ্যা মাত্র ৬। আবার, ২০১১ সালে ২৬ জন সাপের কামড় খান, আর এর মধ্যে বিষধর সাপে কামড়ায় মাত্র ১২ জন মানুষকে।

কিন্তু এই তথ্য কি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মেলে? আমি শুধুমাত্র অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের (২০১৬-২০১৭) সাপ কামড়ের যে পরিসংখ্যান নিজে জোগাড় করেছি, সেই সংখ্যাটা পুরো উত্তর ২৪ পরগনার অফিসিয়াল JSSC-ভিত্তিক সাপের কামড়ের সংখ্যার চাইতে বেশি! এটা কোনো আন্দাজে বলা কথা নয়। অশোকনগর হাসপাতালে আমি সাপে কাটা রোগী নিয়ে বহুবার গেছি, আর সশরীরে উপস্থিতির ভিত্তিতে দেখা ও জানা রোগীদের (যাদের সবাইকে হয়তো আমি দেখিনি, কিন্তু খুব নির্ভরযোগ্যভাবে খবর পেয়েছি) গুনতি করে কথাটি বলছি। আমি যে সংখ্যা এভাবে পেয়েছি, তাতে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, লেখাটি শুরু করার আগে অবধি মোট অন্তত ২৩ জন সাপে কাটা রোগী অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এদের মধ্যে অন্তত ১০ জন বিষধর সাপের কামড়ে। তার মধ্যে আবার কালাচের কামড় খেয়েছেন ৬ জন, গোখরোর কামড় ২ জন, আর চন্দ্রবোড়ার কামড় ২ জন, মোট ১০ জন। আবারও বলি এ হিসাব শুধুমাত্র আমার দেখা ও জানা অনুযায়ী, হাসপাতাল থেকে সঠিক তথ্য পেলে সংখ্যাটি বাড়বে। এটা পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ সামগ্রিক চিত্র সরকারি তথ্যের চাইতে ঢের বেশি ভয়াবহ।

## নিজেদের কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা

নীচের ছবিগুলোর প্রসঙ্গে আসি।

চিত্র ১. ছবিটি আমাদের পাশের বাদামতলা এলাকার একটি মেয়ের সাম্প্রতিক ছবি। কালাচের কামড়ে অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সে তখন চিকিৎসাধীন ছিল।

চিত্র ১. কালাচের কামড়ের লক্ষণ। দু-চোখের পাতা কিছুতেই মেলতে পারছে না।

চিত্র ২. এই ছবিটি কালাচের কামড় খাবার পরে হাসপাতালের চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠা মেয়েটির সঙ্গে মেয়েটির বাড়িতে আমার স্ত্রী কাকলি।

চিত্র ২. ১০ভায়েলস এভিএস দেওয়ায় সম্পূর্ণ সুস্থ ঝুমা

চিত্র ৩. এই ছবিটি অশোকনগর গোলবাজারের দক্ষিণ গেটের সামনে একটি বাড়ির। এখানে কালাচ দেখা গেছে।

চিত্র ৪. সাপ নিয়ে একটু কাজ করেছেন যাঁরা তাঁরা এই ছবির

চিত্র ৩. কালাচ সাপের বাসা

সাপটিকে দেখেই বুঝবেন, মারাত্মক বিষধর কালাচ।

চিত্র ৪. কালাচ সাপ

এবার দেখুন চিত্র ১-এ কালাচের কামড়ের খুব নির্ণায়ক একটি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি তার দু-চোখের পাতা কিছুতেই মেলতে পারছে না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় টোসিস (ptosis)। এই মেয়েটির ইতিহাস আমার জানা—সন্ধ্যে ৬ টা নাগাদ পাড়ার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় মেয়েটিকে কালাচ সাপ কামড়ে দেয়। মেয়েটি সাপের লেজের অংশটুকুই শুধু দেখতে পেয়েছিল। তবু তার বাড়ির লোক বুদ্ধি করে খুব দ্রুত স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। রাত্রি ৯-টার পর মেয়েটির পেটব্যথা হয়, তারপর দু-চোখের পাতা কিছুতেই খুলে রাখতে পারছে না এরকম লক্ষণ (ছবিতে দেওয়া) দেখা যায়। উপযুক্ত সঠিক চিকিৎসায় মাত্র ১০ ভায়াল এ.ভি.এস. দিয়ে মেয়েটি সুস্থ হয়ে ওঠে।

আর চিত্র ৩-এ দেখুন। এটা একটা বাড়ি, আর সেই বাড়ির বাসিন্দারা কিন্তু বিষধর সাপের বাসস্থানকে সঙ্গী করেই নিজেদের বাড়িতে রাতদুপুরে এই রকম পরিবেশে দিব্যি হেঁটে চলে বেড়িয়েছেন, কিছু হয়নি।

জীবন থেকে শেখা—প্রথমেই বলি আমি কোনো সর্প বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তার নই। একজন বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী হিসেবে সাপ নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে যতটুকু জেনেছি তার ভিত্তিতেই কিছু লেখার চেষ্টা

করছি, এবং নিজের জানা কথাগুলো বন্ধুদের মাঝে রাখছি। এটাকে কখনোই জ্ঞান দিচ্ছি এই ভেবে পড়বেন না, আর উপদেশ দেবার ক্ষমতা বা উদ্দেশ্য আমার নেই সেটা দয়া করে বুঝবেন।

শুরুতেই উল্লেখ করেছিলাম দু-মাস আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক) এই সাপের কামড় চিকিৎসা বিষয় নিয়ে তুমুল ঝড় বয়ে গেল। আমার কিছু পরিচিত বন্ধুসহ বেশ কয়েকজনকে দেখলাম কিছু ডাক্তারদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। কেউ আবার ডাক্তারদের কী করা উচিত, কী উচিত নয় ইত্যাদি অনেক কিছুই লিখেও দিলেন। তার প্রত্যুত্তরে কিছু ডাক্তারবন্ধুও দেখলাম মূল সমস্যার দিকটাকে আলোচনা না করে রে-রে করে তেড়ে উঠেছেন। জানি না এতে করে মূল সমস্যার কোনো সমাধান হয় বা হয়েছে কিনা। কিন্তু কিছু বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে নিজের রাগ যন্ত্রণা ইত্যাদি ফেসবুকের বাতাসে ছুঁড়ে আস্ফালনটুকুই হল। আর বাস্তবিক সমাজের চেহারা কী দেখছি? দেশের রাষ্ট্রীয় কালাচ সাপগুলো, যারা কিনা সত্যিকারে কালাচের চাইতে ঢের বেশি ক্ষতিকর, তারা মুচকি হেসে নিরীহ জনগণকে বলছে—স্বাস্থ্য এ দেশে, আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে, হয় জনগণকে ভিক্ষা করে নিতে হবে, নয়তো ফেলো কড়ি মাখো তেল। যদি অর্থ থাকে তবে পাবে স্বাস্থ্য, আর না হলে ওই বড়ো হাসপাতাল বাড়ির নতুন রং দেখেই আমায় ভোটটা দিও, ব্যস! চিকিৎসাটা আজ পণ্য। সেটা নিয়ে আমরা, আমাদের ফেসবুকের বন্ধুরা, সত্যিকারের গর্জন করলে হয়তো অবস্থাটা বদলাত। কিন্তু মাপ করবেন, এসব বড়ো বড়ো কথা আমার বলাটা ঠিক হচ্ছে না, আমি স্রেফ কাজের কথাটাই বলি।

## কেন ডাক্তাররা সবসময় ঠিক চিকিৎসা করতে পারেন না?

শুনেছি ডাক্তারি পাঠক্রমে সাপ বিষয়ে নাকি খুবই কম গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। এটা আমার কথা নয়। এ কথাগুলো আমার কিছু ডাক্তার বন্ধুদের থেকেই শোনা। অনেক সত্যিকারের জনদরদি ডাক্তারবন্ধুই অকপটে স্বীকার করেন তিনি সাপ কামড়ের চিকিৎসা জানেন না। সেটা তাঁর দোষ নয়, আমাদের দেশে ডাক্তারি সিলেবাসে সাপের কামড়ের ব্যাপারটা একেবারে গুরুত্বহীন। একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব ডাক্তার আমাকে বললেন, তাঁর আমলে সাপের কামড় নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে শুধু যে প্রায় কিছুই শেখানো হত না তা-ই নয়, যেটুকু শেখানো হত তাও ছিল ভুলে ভর্তি। এভিএস-এর গুরুত্ব তেমন দেওয়া হত না, বলা হত সাপের কামড়ের দাগ দেখে বিষাক্ত সাপ কিনা বুঝে চিকিৎসা করতে হবে। আজ আমরা জানি এভিএস রোগীকে ক্লিনিক্যালি খতিয়ে দেখে, ও দরকারে সামান্য পরীক্ষা করে দেওয়া যায়; জানি যে সাপের কামড়ের দাগ দেখে বিষাক্ত নয় বলাটা মারাত্মক ক্ষতি করে দিতে পারে। কথা হল, এই না-জানার দোষটা কি ওই ব্যক্তি ডাক্তারের, নাকি আমাদের ডাক্তারি শিক্ষাব্যবস্থার?

আরেকটা কথা। বয়স্ক এই ডাক্তার বন্ধুদের অকপটে ঘোষণা কি প্রমাণ করে যে তিনি সত্যিই ডাক্তারিটা জানেন না! নিশ্চয়ই নয়। তিনি অনেক ডাক্তারে মতোই চিকিৎসাবিদ্যাটা ভালোই জানেন। আসলে পরিস্থিতি পরিবেশ অনুযায়ী অনেক কিছুই ডাক্তারদের নতুন করে অনেক কিছু স্টাডি করতে হয়। সেরকমই পরিবেশগতভাবে প্রয়োজন থাকলে সাপ কামড়ের সঠিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাও শিখতে হয়। আর শেখার জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আর শেখার ইচ্ছা—দুটোই দরকার। এই বোধটা আমাদের, বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে না থাকলেই গণ্ডগোল।

আমাদের দেশে সাপের কামড়ের সমস্যা যে আর পাঁচটা রোগব্যাধির মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ তা আমাদের সমাজের মাথারা অনেকেই মানতে চান না। সরকারি পরিসংখ্যান (আগেই বলেছি, ভীষণ কমিয়ে দেখা) যতই বলুক সাপের কামড়ে মৃত্যু এ দেশে গড়ে বছরে পঞ্চাশ হাজার, তবুও বিষয়টিকে এখনও শুধু মাত্র গ্রামের সমস্যা ভেবে চুপ থাকা হয়। একে গরিব, তায় আবার হাসপাতালে এসে বা না এসে, বিনা চিকিৎসায় বা ভুল চিকিৎসায় মরলেও এদের নাম খবরের কাগজে উঠবে না। এদের সমস্যা নিয়ে ভেবে লাভ কী? বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এর চিকিৎসাকে যে কিছুটা অন্তত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেটাও কিন্তু ডা. দয়ালবন্ধু মজুমদারের মতো শ্রদ্ধেয় কিছু ডাক্তার ও মানুষদের ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হচ্ছে।

## চিকিৎসাব্যবস্থার এই ভুলের ফল কারা ভুগছেন?

যাঁরা প্রত্যন্ত গ্রামের হাসপাতালগুলোতে থাকেন তাদের অভিজ্ঞতা সবচেয়ে করুণ! প্রথমত রয়েছে গ্রামের মানুষের ভুল বিশ্বাস। বেশির ভাগ গ্রামের মানুষ এখনও মনে করেন সাপের কামড় মানেই ওঝা-গুণিনই একমাত্র পথ। তাই শেষমেষ যখন সাপের কামড়ের রোগীরা ওঝা-গুণিন করে গ্রামের হাসপাতালগুলোতে আসেন তখন সংকটজনক রোগীর পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁকে সেই মুহূর্তে যে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা দেওয়া দরকার, সেটা দেবার মতো পরিকাঠামো গ্রামের ডাক্তাররা পান না। ব্যতিক্রম যে কিছু ঘটেনি তা নয়, তবে সেটা সংখ্যায় খুব কম। প্রত্যন্ত গ্রামের হাসপাতালে অস্থায়ী ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করে মুমূর্ষু সাপে কাটা রোগীকে মেদিনীপুর জেলাতেই বাঁচানো যে সম্ভব হয়েছে, তা কিন্তু হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে সেই সব ডাক্তারবন্ধুদের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। কিন্তু এটাও অস্বীকার করা ঠিক নয় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বহু ডাক্তার উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারেন না, এবং তার জন্য দুটো জিনিস দায়ী। এক হল পরিকাঠামোর দুরবস্থা। দুই হল ডাক্তারের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ বা জ্ঞানের অভাব। এর ফলে যা হবার তাই ঘটে—ডাক্তার লেখেন রেফার টু শহরের হাসপাতাল। বহু ক্ষেত্রেই রোগী শহরের হাসপাতালে যাওয়ার পথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

সাপ থাকে গ্রামে কিন্তু উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো রয়েছে শহর হাসপাতালে! কী অসাধারণ আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা! জানি না এই বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের আর কবে ঘুম ভাঙবে! পিছিয়ে পড়া গ্রামের হাসপাতালগুলোতে সাপ কামড়ের চিকিৎসা যতটুকু এখনও হচ্ছে,

আমার বলতে দ্বিধা নেই সেটা সম্ভব করে তুলছেন কিছু ডাক্তারের আন্তরিক প্রচেষ্টা; এঁরা চিকিৎসাটা নিজেদের মানবিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। বর্ধমানের ভাতার এর একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। আবার উলটোদিকে, এই কথাটাও বলতে হবে, কিছু সুবিধাবাদী ডাক্তার এই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অব্যবস্থার সুযোগে রেফার করে নিজে দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি নিচ্ছেন। তাঁদের কেউ কেউ উলটে জনগণের ওপর দায় চাপিয়ে বলে উঠছেন, মানুষের উগ্র মনোভাবের জন্যই নাকি তাঁদের এই পথ বেছে নিতে হচ্ছে! কিন্তু আমি যতদুর জানি, যদি শুরুতেই রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে আসা যায় তাহলে সাপ কামড়ের চিকিৎসা একটি প্রত্যন্ত গ্রামের হাসপাতালেও করা সম্ভব। আমার ভুল হতে পারে, আমি ডাক্তার নই, বিশেষজ্ঞও নই। আমি ভুল বললে ধরিয়ে দেবেন।

আবার পাশাপাশি এ কথাটাও বলে রাখি, ডাক্তারদের এই আশঙ্কা অন্তত এখন একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। আমাদের অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক খুব গুরুত্ব দিয়ে সাপ কামড়ের চিকিৎসার প্রস্তুতি হিসেবে রোগীর হাতে স্যালাইনের চ্যানেল করতে গিয়ে শুনছেন রোগীর হুংকার। রোগী এসব সাপের কামড়ের চিকিৎসা করবেন না। তাঁর কোনো শারীরিক অসুবিধা হচ্ছে না, সুতরাং তাঁর শরীরে সাপের বিষ নেই। এইসব রোগীকে বোঝানো খুব শক্ত—তাঁরা মানবেনই না যে কালাচের কামড়ে প্রথমে কোনো শারীরিক উপসর্গ বা লক্ষণ থাকে না। এরপর যদি চিকিৎসক বাধ্য হয়েই তাঁর জানা বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা না করতে পারেন, আর তার ফলেই যদি অঘটন কিছু ঘটে যায়, তখন কিন্তু সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পরে চিকিৎসকের উপর! এই পাপচক্র ভাঙার দায়িত্ব সকলকেই নিতে হবে।

## বিজ্ঞানকর্মীর ভূমিকা

আমার নিজস্ব সামান্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি একজন বিজ্ঞানকর্মী সাপ কামড়ের চিকিৎসা বিষয়ে একজন আধুনিক চিকিৎসকের সহযোগী স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন। তিনি অবশ্যই কী চিকিৎসা হবে সেই নির্দেশ দেবেন না, সেটা অনধিকার চর্চা হবে। তাহলে কীভাবে ভূমিকা পালন করবেন তিনি?

১. সাপটিকে শনাক্ত করে ডাক্তারবাবুদের সঠিক চিকিৎসার জন্য জানানো সাপটি বিষধর না নির্বিষ।

২. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যাকে সাপ কামড়েছে তিনি সাপটিকে দেখেননি বা চিনতে পারেননি। সেক্ষেত্রে তার সঠিক ইতিহাস নিয়ে, ও অঞ্চলভিত্তিক কী কী সাপ আছে সেই ধারণা তৈরি করে, তার ভিত্তিতে চিকিৎসককে সঠিক তথ্য জানানো যায়।

৩. সাপটি কোন সময় এবং কখন কামড়েছিল তার সঠিক ইতিহাস। ধরা যাক ভোরবেলা বা সন্ধ্যেবেলা গ্রামের পাড়ার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সাপের কামড়ের ঘটনা ঘটল। এক্ষেত্রে সেই এলাকায় কোন কোন বিষধর সাপ আছে জানা থাকলে বুঝতে অনেক সহজ হয়।

৪. কোন সাপের স্বভাব কী, সেটাও বিজ্ঞানকর্মী চিকিৎসককে বলতে পারেন—যেমন কালাচের স্বভাব হল বিছানায় বা মাটিতে শুয়ে থাকা মানুষকে কামড়ানো। বিশেষ করে মশারি ছাড়া শুয়ে থাকলে যে এলাকায় কালাচের উপদ্রব আছে সেই এলাকায় কালাচের কামড় হতে পারে, আর সেই কামড়ের দাগ নেহাত সামান্য হতে পারে, রোগীর হয়তো কোনো রোগলক্ষণই প্রথমদিকে না থাকতে পারে।

৫. এছাড়াও কিছু কিছু সাপকে দেখে আলাদা করা যায় না। যেমন ঘরচিতি এবং কালাচ আলাদা করা খুব শক্ত। একইভাবে বিষধর চন্দ্রবোড়া এবং নির্বিষ তুতুর সাপের চেহারায় পার্থক্য করাও কঠিন। সেই সামান্য পার্থক্য, এদের অবস্থান, কামড়ের চিহ্ন, ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা চিকিৎসককে জানালে চিকিৎসায় সুবিধে হয়।

৬. যাকে সাপে কামড়েছে তাকে মানসিক সাহস দেওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাকে বোঝানো দরকার যে আজকাল সাপের কামড়ে কেউ মারা যান না। হাসপাতালে সাপের কামড়ের সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এই কথাগুলো সাপের কামড়ের রোগীকে বাড়িতে ও হাসপাতালে বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭. অনেক সময় রোগীর আত্মীয়রা সাপটিকে মেরে পুড়িয়ে নিয়ে আসেন। এটা একদমই ঠিক নয়। এক্ষেত্রে সাপটিকে চিহ্নিত করা খুব কঠিন, তবুও সাপের আঁশ দেখে সাপটিকে শনাক্ত করা যায়, কিন্তু এই বিষয়ে যারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত একমাত্র তাদের পক্ষেই তা করা সম্ভব। দোগাছিয়ার সোনালি ঘোষের কথা আমার মনে পড়ছে। সেখানকার গ্রামবাসীরা সাপটিকে মেরে পুড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সাপটি ছিল কালাচ। শুরুতে কিন্তু চিকিৎসক সোনালির শরীরে এভিএস দিতে অস্বীকার করেন, কারণ সোনালির শরীরে কোনোরকম শারীরিক উপসর্গ ছিল না ও সাপটি বিষধর এমন প্রমাণও ছিল না। শেষে পোড়া সাপের গায়ের আঁশ আমার সংগ্রহে রাখা ফর্মালিন বোতলে সংরক্ষিত কালাচ সাপের আঁশের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, সেটা চিকিৎসককে দেখালে তিনি বোঝেন সত্যিই কালাচ কামড়েছে। তখন শারীরিক উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা দেবার আগেই তিনি ১০ ভায়াল এ.ভি.এস. দেন ও সোনালী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরে। লক্ষ করুন, চিকিৎসক প্রথমে এভিএস দেননি, সেটা কিন্তু তাঁর ভুল নয়, বরং সেটাই বিজ্ঞানসম্মত। তখনও পর্যন্ত বিষধর সাপ কামড়েছে এমন ভাবার কোনো যুক্তি ছিল না। কিন্তু যখনই তিনি গ্রামবাসীদের পুড়িয়ে আনা সাপের আঁশ আর কালাচের আঁশ পাশাপাশি ফেলে বুঝতে পারলেন ওটা কালাচ সাপই, তখনই তিনি এভিএস দিলেন।

৮. অনেক ক্ষেত্রেই হাসপাতালে আনার আগে বাঁধন খুব কষে দেওয়া হয়। এটা বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে মারাত্মক ক্ষতিকর, কামড়ের জায়গা ও তার আশপাশে গ্র্যাংগ্রিন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কোনো বিষধর সাপের কামড়েই বাঁধনের প্রয়োজন পড়ে না, আর বাঁধন দিয়ে সাপের বিষ আটকানো যায় না।

৯. সাপটা যদি খুঁজে পাওয়া না যায় তবে কামড়ের ইতিহাস, সেখানে কোন কোন সাপ বেশি আছে, কখন কীভাবে সাপটি কামড়েছে, এসব

তথ্য একজন বিজ্ঞানকর্মী খুব ভালোভাবে ডাক্তারকে দিতে পারেন। তারপর কামড়ের চিহ্ন দেখে খানিকটা বোঝা যায়। এতে বোঝা না গেলে, শারীরিক উপসর্গ এবং লক্ষণ দেখে তবেই বিষধর সাপ নিশ্চিত হওয়া যায়, ও তারপর এভিএস দেওয়া হয়।

১০. সাপের কামড়ের একমাত্র প্রতিষেধক এভিএস-এর সপক্ষে লাগাতার প্রচার এবং ওঝা-গুণিনদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলাও একটি দরকারি পদক্ষেপ। আমরা জানি সাপের কামড়ের চিকিৎসা আর পাঁচটা চিকিৎসার মতো নয় যে, আজ জ্বর হয়েছে, দেখি দু-দিন, জ্বর না সারলে পরে ডাক্তার দেখাব—এমনটা করা যাবে। সাপের কামড়ের চিকিৎসা খুব দ্রুত হওয়া প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি সঠিক চিকিৎসা শুরু হলে রোগীর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা ১০০ শতাংশ। তাই রোগীটিকে সাপে কামড়ের ঘটনার পর থেকে হাসপাতাল যেতে যেতে রোগীর কোন কোন উপসর্গ, কী কী লক্ষণ দেখা দিচ্ছে সেগুলো নোট করে রেখে যে কেউই চিকিৎসককে এই বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারেন।

চিকিৎসক চিকিৎসা করবেন এ তো সোজা হিসাব। কিন্তু সব চিকিৎসকই কি সাপ চেনেন? এই বিষয়টিও মাথায় রাখা দরকার। সকল চিকিৎসকের চেনার কথাও নয়। কারণ যে পরিবেশে সাপ থাকে অনেকেই সেই পরিবেশ থেকে উঠে এসে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পান না, আর চিকিৎসা বিদ্যার পাঠক্রমে সাপ ধরে ধরে চেনানোও হয় না। এমনকী বিভিন্ন বিষধর সাপের উপসর্গ ও লক্ষণগুলো ঠিক কীরকম তা সব ডাক্তারবাবু জানার সুযোগ পান না। আজ অনেকের জানা কালাচের কামড়ের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গের মধ্যে পেটব্যথা অন্যতম। যদি সাতসকালে কোনো গ্রামের রোগী এসে শুধু মাত্র পেটব্যথা নিয়ে ভর্তি হন তাহলে চিকিৎসক পেট ব্যথার চিকিৎসাই শুরু করবেন। যদি সেই চিকিৎসকের কালাচ সাপের কামড়ের উপসর্গ নিয়ে সম্যক ধারণা না থাকে তো কালাচ সাপের কামড়ের সম্ভাবনা তাঁর মাথাতেই আসবে না, আর সেটা সবসময় তাঁর দোষ নয়। এই ঘটনা কলকাতার হাসপাতালগুলোতেই ঘটেছে। কাজেই যাঁরা এই বিষয়ে আগ্রহী তাদেরকেই সাপ কামড়ের চিকিৎসা বিষয়ক বই-পত্র পড়ে সাপ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিতে হয়।

তবে দুঃখের কথা হল, ডাক্তারি পাশ করার পর কিছু কিছু ডাক্তার ভাবেন আবার নতুন করে সাপ কামড়ের চিকিৎসা শিখব কেন? আর সাপ চিনতে যাবই বা কেন, ওটা তো গ্রামের ব্যাপার। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ডাক্তারদের সাপ চেনারও দরকার হয় না, রোগীর সাপের কামড়ের উপসর্গ, লক্ষণগুলো দেখেই তো সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব। সেই বিষয়গুলো দু-এক দিনের ট্রেনিং নিলেই শিখে নেওয়া সম্ভব। তবে হ্যাঁ সাপটা চেনা বা জানা থাকলে চিকিৎসাটা অনেক সহজ হয়ে পড়ে। আবার কোন কোন বিষধর সাপ কী পরিস্থিতিতে কামড়ায় (যেমন কালাচ মশারি ছাড়া বিছানায় শুলে কামড়ায়) সে ব্যাপারে জ্ঞান অনেক সময় রোগীর উপসর্গ ও লক্ষণ বিচার, যেটা ডাক্তাররা সব রোগেই করে থাকেন, সেটার মতোই কার্যকর হতে পারে। আমি মনে করি একজন বিজ্ঞানকর্মীর এই বিষয়ে ধারণা থাকলে, ও তিনি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে মত বিনিময় করলে, আখেরে সাপে কামড়ের রোগীটিই উপকৃত হয়।

## উপসংহার

কথাগুলো বলা সহজ, কিন্তু বাস্তবটা বড়ো কঠিন। তবুও কাউকে না কাউকে তো এই দায়িত্ব নিতেই হয়। অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে যেমন ডা. রণজিৎ দে, ডা. অপর্ণা ভট্টাচার্য, ডা. সুখেন্দু বিশ্বাসের মতো ডাক্তাররা আছেন, তেমন বর্ধমানের ভাতার হাসপাতালের ডা. সংঘমিত্রা মিত্র, ডা. মানস দত্ত সহ বহু ডাক্তারবন্ধুরাই এই চিকিৎসার গুরু দায়িত্বভার পালন করে যাচ্ছেন। আরও অনেক ডাক্তার আছেন যাদের নাম আমার জানা নেই বা এই মুহূর্তে স্মরণে নেই।

সমস্যা হয় তখন, যখন কিছু সরকারি ডাক্তার বিষয়টি গ্রামের সমস্যা ভেবে এর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেন। গ্রামে কাজ করেন এমন সব ডাক্তারের সাপ কামড়ের চিকিৎসা শিখে এই দায়িত্বটি পালন করা উচিত। আমি যতদুর জানি ডা. দয়ালবন্ধু মজুমদার একক উদ্যোগে বিভিন্ন হাসপাতালে ছুটে যাচ্ছেন শুধু মাত্র একটিই স্বার্থে—গ্রামের মানুষ আর যাতে সাপের কামড়ে বিনা চিকিৎসায় মারা না যান। আজ এটা প্রমাণিত ডাক্তার এবং নার্সদের সাপের কামড় বিষয়ে সঠিক ট্রেনিং দেওয়া হলে প্রত্যন্ত গ্রামের হাসপাতালগুলোতে এই চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে সাপের কামড়ের চিকিৎসা-পদ্ধতি বিজ্ঞানকর্মীদের জানা থাকলেও ডাক্তারদের চিকিৎসা বিষয়ে নির্দেশ জারি করাটা আমার কাছে অন্যায্য বলেই মনে হয়। ডাক্তারের ওপর রোগীকে চিকিৎসার ভার, রোগীর খারাপ কিছু হলে তিনি তো বলতে পারবেন না, তিনি বিজ্ঞানকর্মীদের কথামতো কাজ করেছেন, তাই খারাপ হবার দায়িত্ব বিজ্ঞানকর্মীর! এমন কথা কি ডাক্তারবাবুর ওপরওয়ালা শুনবেন, নাকি রোগীর আত্মীয় পরিজন শুনবেন? তাই বলি, ডাক্তারের কাজ ডাক্তারবাবুরা করবেন, আর আমরা বিজ্ঞানকর্মীরা ডাক্তারকে আমাদের জানা কিছু তথ্য দিয়ে এই বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারি, এর বেশি কিছু নয়।

পরিশেষে আবার বলব, সাপ নিয়ে কাজ করার মধ্যে দিয়ে দেখেছি এই পারস্পরিক সহযোগিতায় সবচেয়ে উপকৃত হন সাপে কামড়ের রোগী ও তাঁর পরিবার। হ্যাঁ, এটুকুই আমাদের মানবিক পুরস্কার। আর কিছু ডাক্তার যদি তিনি তার নিজস্ব 'ডাক্তার' অহংবোধে বিজ্ঞানকর্মীর কথা না শোনেন তবে তাতে করে তো আমরা তাকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করতে পারি না। রোগীটির কোনো বিপদ ঘটলে তিনিই ভাববেন তার অহংবোধকে আর তিনি সঙ্গী করে চলবেন কিনা।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক একজন বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী

# অনিতা: NEET, নয়া উদারনীতি, ডাক্তারি নৈতিকতা ও একটি মৃত্যু।

ডা. দেবাশিস হালদার

তামিলনাড়ুর আরিয়ালুর জেলা। সেখানকার দিনমজুরের মেয়ে অনিতা। দলিত পরিবারে জন্ম নেওয়া, ডাক্তার হবার স্বপ্ন দেখা, ১৭ বছরের অনিতা। শনমুগাম অনিতা। তামিলনাড়ু রাজ্য বোর্ডের ১০+২ পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিদ্যায় দুশোয় দুশো, রসায়ন, জীববিজ্ঞানে একশো নব্বই-এর উপর নাম্বার পাওয়া অনিতা। আজ্ঞে না, কেবল প্রতি উচ্চমাধ্যমিক মাধ্যমিক পরীক্ষার পর আমাদের মধ্যবিত্ত ফিলানথ্রোপিক মননকে শিহরিত করা "অমুক গ্রামের কাগজকুড়ুনির ছেলে/মেয়ে অমুক বিষয়ে লেটার পেল" গোছের হেডলাইনের চরিত্র, সে নয়। গল্পটা শুরু এর পর থেকে। এর আগে তামিলনাড়ুতে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ মিলত তামিলনাড়ু রাজ্য বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় প্রাপ্ত নাম্বারের উপর ভিত্তি করে। (৮৫% আসন সংরক্ষিত থাকত রাজ্য বোর্ডের জন্য)। কিন্তু গত বছর দীর্ঘ রায়, পালটা রায়ের নাটকের শেষে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে সারা দেশজুড়ে একটিই অভিন্ন ডাক্তারি প্রবেশিকা (NEET বা National Eligibility Entrance Test) পরীক্ষা হবে। কোনো রাজ্য আলাদা করে সেই রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলির ভর্তির জন্য প্রবেশিকা নিতে পারবে না (পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হত WBJEEM-এর দ্বারা, এই রায় অনুযায়ী এ-রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড আর WB-

নাকি ডাক্তার তারাই হবে যাদের প্রস্তুতি 'কেনা'-র অর্থনৈতিক সামর্থ্য আছে? গল্প বা সিনেমা যদি হত জিতিয়ে দেওয়া যেত জেদি মেয়েটাকে।

JEEM নিতে পারবে না)। সেই NEET পরীক্ষায় অনিতা ৭২০-তে পেল মাত্র ৮৬ নাম্বার। আগের বছরের কাট অফের হিসেবে ১০+২ পরীক্ষার প্রাপ্ত নাম্বার অনুযায়ী যে অনিতার অনায়াসে ডাক্তার হবার সুযোগ পাওয়ার কথা, অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রাপ্ত নাম্বারের হিসেবে (এবং আমার আপনার চালু 'ফর্মাল লজিক'-এর যুক্তিকাঠামো অনুসারেও বটে) এক মুহূর্তে খারিজ হল সেই স্বপ্ন। সে নাছোড়বান্দা মেয়ে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করে বসল। সে বলল তার যুক্তি। দিনমজুরের মেয়ে সে, কীভাবে NEET-এর প্রশ্নপত্রের জন্য (যা কিনা CBSE বোর্ডের সিলেবাসের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি, তার রাজ্যবোর্ডের সিলেবাস, প্রশ্নের ধরনের সঙ্গে যার মিল নেই কোনো) প্রস্তুত হবার কোচিং-এর সামর্থ্য হবে তার? নাকি ডাক্তার তারাই হবে যাদের প্রস্তুতি 'কেনা'-র অর্থনৈতিক সামর্থ্য আছে? গল্প বা সিনেমা যদি হত জিতিয়ে দেওয়া যেত জেদি মেয়েটাকে। কিন্তু যেহেতু এটা বাস্তব এবং বাস্তবে বিচারব্যবস্থা রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ এবং রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের শ্রেণিচরিত্র আমাদের অজানা নয়, পিটিশন খারিজ হল। সরকারি পক্ষের উকিল বললেন "Any further appeal against NEET can only be done to God।" হাল ছাড়তে বাধ্য হল হার মানতে না চাওয়া অনিতা। এবং হারার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করল সে।

গোটা ঘটনাপ্রবাহ অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও খুব অপ্রত্যাশিত ছিল না। অনিতার মৃত্যু যে সব প্রশ্নের মুখোমুখি করল আমাদের তা যদি একটু তলিয়ে দেখা যায় তাহলে এটা বুঝতে সমস্যা থাকার কথা নয় যে, যেভাবে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নয়াউদারনৈতিক আগ্রাসন নেমে এসেছে পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের (ইউপিএ) সময় থেকে, সে ধারা এখনকার ফ্যাসিবাদী বিজেপি সরকারের হাত ধরে আরও আরও পরিপুষ্ট হবে। ফলত, আরও গভীরভাবে এই সিদ্ধান্ত, সরকারের শিক্ষানীতি, কোন জায়গা থেকে এর বিরোধিতা জরুরি সে নিয়ে চর্চা প্রয়োজন।

দেখে নেওয়া যাক, NEET চালু করার পিছনে সুপ্রিম কোর্টের যুক্তিগুলি যথাক্রমে কী কী ছিল?

১. গোটা দেশব্যাপী একই মানের ডাক্তার তৈরি করার জন্য অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রয়োজন।

২. বিভিন্ন রাজ্যে ও কলেজগুলিতে বিভিন্ন প্রবেশিকার সুযোগে যে অবাধ দুর্নীতি চলত, NEET তা রুখতে সাহায্য করবে।

প্রথম যুক্তিটি নিয়ে কাটাছেঁড়ায় যে প্রশ্নগুলো ওঠানো প্রয়োজন সেগুলি হল একই মানের ডাক্তার বলতে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে, কী জন্য আজ হঠাৎ প্রয়োজন হচ্ছে একই মানের ডাক্তার? নিট-এর ফলে যে ছাত্রছাত্রীরা ডাক্তারি পড়তে ঢুকবে (মানে ঢোকার সুযোগ পাবে) তাদের অধিকাংশের মননে ঠিক কোন কোন 'একই মানের' মূল্যবোধ থাকবে? কোন 'একই মানের' অর্থনৈতিক বর্গের ছাত্রছাত্রীরা হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের ডাক্তারকুল?

আসলে প্রশ্নগুলোর উত্তর জড়িয়ে আছে বিগত ১০ বছরের আমাদের

স্বাস্থ্যব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে (এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি নৈতিকতার সংজ্ঞার 'বাজার' নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনের সঙ্গেও)। বিভিন্ন মহানগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা (এমনকী মফস্সলেও ছড়িয়ে পড়া) বেসরকারি কর্পোরেট হাসপাতাল, স্বাস্থ্য পর্যটন একদিকে স্বাস্থ্য নিয়ে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ধারণাকে নস্যাৎ করছে, অপরদিকে কেবল মুষ্টিমেয় পয়সাওয়ালা মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকা বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে স্বাস্থ্যের উন্নতির সূচক হিসেবে দেখিয়ে কেবল কর্পোরেট পুঁজির ব্যাবসা বাড়িয়ে চলেছে!

আর এই কর্পোরেট মেডিক্যাল-শিল্পের (সচেতনভাবেই 'শিল্প' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে) জন্যে দরকার হয়ে পড়ছে প্রচুর সংখ্যক

এই কর্পোরেট মেডিক্যাল-শিল্পের . . . জন্যে দরকার হয়ে পড়ছে প্রচুর সংখ্যক ইংরেজি জানা শহুরে উচ্চমধ্যবিত্ত ডাক্তারের . . . যাদের অধিকাংশই শহুরে পরিবেশে বেড়ে উঠেছে . . .

ইংরেজি জানা শহুরে উচ্চমধ্যবিত্ত ডাক্তারের (বলা ভালো, দক্ষ স্বাস্থ্য-শ্রমিকের) যাদের অধিকাংশই শহুরে পরিবেশে বেড়ে উঠেছে, ফলতই পণ্য মানসিকতা তাদের মননে সুবিকশিত। এদেরই বাজার বলছে 'একই মানের ডাক্তার'।

ছাত্রছাত্রীদের যে বর্গটা মেডিক্যালে সুযোগ পাবার জন্য আকাশ, পাথফাইন্ডার-এ এত এত টাকা খরচা করে পড়াশোনার প্রস্তুতি নিচ্ছে (অবশ্যই অনিতার মতো দিনমজুরের মেয়েরা ছেলেরা সেই বর্গে পড়ে না) ডাক্তার হবার পরও তাদের মূল মানসিকতা থাকবে, অন্তত থাকাটাই যুক্তিসঙ্গত, যে ডাক্তারি করে সেই বিরাট টাকার অঙ্কটা সুদে-আসলে উশুল করতে হবে। একটি কেন্দ্রীয় পদ্ধতিতে এই পণ্য-মানসিকতা, এই কর্পোরেট যুক্তিতে অভ্যস্ত উচ্চমধ্যবিত্ত ডাক্তারই গোটা দেশজুড়ে বানাতে চাইছে সরকার। তারই প্রথম ধাপ NEET। এর পরের ধাপগুলো কোথাও গিয়ে ছয় মাসের প্রাক্-মেডিক্যাল পাঠ্যসূচি হতে পারে যেখানে ডাক্তারদের 'বাচন দক্ষতা' শেখানো হবে (ঠিক কী কারণে, কোন স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় ইংরেজি বাচন দক্ষতা প্রয়োজন হয় সেটা বোঝা কষ্টসাধ্য নয়), কোথাও হতে পারে গোটা মেডিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থার বেসরকারিকরণের (এই NEET যে কপিল সিব্বলের মস্তিস্কপ্রসূত, তাঁরই পরিকল্পনা এগুলো এবং বর্তমান সরকার এখনও এগুলো নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি, বাতিল করা দূরে থাক)। এখানেই NEET-এর পরিকল্পনা স্বাস্থ্যব্যবস্থায় নয়া উদারনৈতিক আগ্রাসনের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

আসা যাক দ্বিতীয় যুক্তিতে। সুপ্রিম কোর্ট বলছে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ NEET-এর আওতায় এলে দুর্নীতি কম হবে। কিন্তু বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলো ক্যাপিটেশন ফি নিতে পারবে কিনা, সে নিয়ে আদালতের রায়ে কিন্তু কিছুই বলা নেই। মূল দুর্নীতির উৎস যে ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে আসন কেনা, তা বন্ধ না করে, তা নিয়ে একটা কথাও না বলে, কেবল একটি অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে দুর্নীতি রুখে দেওয়া যাবে . . . এটা চরম হাস্যকর যুক্তি, বলা ভালো কুযুক্তি! যদি দুর্নীতি রুখতেই হয়, তাহলে দুর্নীতির আখড়া সব বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলো বন্ধ করা হোক, বদলে যথার্থ পরিকাঠামোযুক্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ চালু করা হোক। কিন্তু তা করা হচ্ছে না, হবেও না। কারণ শিক্ষা-স্বাস্থ্যকে ব্যবসায় পরিণত করার স্বার্থ তা দিয়ে বরং বিঘ্নিত হবে ।

বিরোধিতার অন্য একটি দৃষ্টিকোণও আছে। প্রথম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল গোটা দেশজুড়ে কেবল ইংরেজি ও হিন্দিতে একই প্রশ্নপত্র করা হবে। ২০১৩ সালের নিট পরীক্ষা এই পদ্ধতিতেই হয়। এই শিক্ষাবর্ষে ভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় NEET-এর প্রশ্নপত্র হলেও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার প্রশ্নপত্রে কোনোরকম ত্রুটিবিচ্যুতির দায় পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা CBSE নেবে না বলে জানায়। তথ্য বলছে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে নিট-এর বাংলা ও গুজরাটি ভাষার প্রশ্নপত্র তুলনায় কঠিন ছিল। আজ্ঞে হ্যাঁ, আঞ্চলিক ভাষায় প্রশ্নপত্রগুলি আলাদা আলাদা ছিল, একই প্রশ্নপত্রের বাংলা-গুজরাটি-তামিল অনুবাদ যে করা যায়, সেটা কর্তারা ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। 'অভিন্ন' প্রবেশিকার ন্যূনতম শর্তও কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে না? তথ্য আরও বলছে পশ্চিমবঙ্গের প্রথমদিকে থাকা মেডিক্যাল কলেজগুলোতে এই বছর ডাক্তারিতে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের অত্যন্ত কম একটি শতাংশ NEET-এ বাংলা প্রশ্নপত্রে

সরকারের চিন্তা আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ যারা বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা 'কিনতে' পারেন না তাদের নিয়ে নয়, বরং যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষ বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম ইত্যাদির 'ক্রেতা' হয়ে স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের পকেট ভারী করতে পারবেন শুধু তাদের নিয়েই।

উত্তর করে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। এই বিষয়টিও একটু সূক্ষ্মভাবে কাটাছেঁড়া করা যাক।

প্রথমত এটা জানা কথাই, সাধারণভাবে বাংলা বা অন্য আঞ্চলিক ভাষাভাষী মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় ইংরেজি মাধ্যমের উচ্চমধ্যবিত্ত, নব্য অভিজাত, পণ্য মানসিকতায় অভ্যস্ত ছাত্রছাত্রীরা এই কর্পোরেট সংস্কৃতির সঙ্গে অনেক সহজে অভ্যস্ত হতে পারে! অর্থাৎ কিনা সরকারের চিন্তা আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ যারা বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা 'কিনতে' পারেন না তাদের নিয়ে নয়, বরং যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষ বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম

ইত্যাদির 'ক্রেতা' হয়ে স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের পকেট ভারী করতে পারবেন শুধু তাদের নিয়েই। জানিয়ে রাখা ভালো, ২০১৩-তে NEET ইংরেজি ও হিন্দিতে হওয়ার পর যখন প্রথম সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানানো হয় এর বাইরেও আরও সাতটা আঞ্চলিক ভাষায় প্রশ্নপত্র করতে, তখন মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে ইংরেজি ও হিন্দিতেই প্রশ্ন করার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছিল। কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছিল গোটা মেডিক্যাল পাঠ্যক্রম ইংরেজিতেই পড়তে হয়। তাহলে হিন্দি কেন? সে প্রশ্নের উত্তর বোধকরি আমাদের সরাসরি হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান মার্কা রাজনীতির মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে, কিন্তু এখানে সেটা বলার অবকাশ নেই।

কোন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে NEET-এর বিরোধিতা, তা জানা-বোঝার পাশাপাশি যে ছাত্রছাত্রীরা NEET দেবে, সুযোগ পাবে অথবা পাবে না, তাদেরকেও এই বিশ্লেষণ, বিতর্কের পরিসরে আনতে হবে

সাড়ে পাঁচ বছরের ডাক্তারি পড়াশোনা ও তারপর ডাক্তারির যতটুকু যা অভিজ্ঞতা তা থেকে এটুকু অন্তত জানি, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিন যে বিপুল সংখ্যক রোগীদের সম্মুখীন আমরা হই তাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম আর যাই হোক অন্তত ইংরেজি নয়। তো এক্ষেত্রে যেটা বলার, পৃথিবীর বহু দেশে কিন্তু নিজেদের ভাষায় গোটা মেডিক্যাল বিষয়বস্তু পড়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে কেন বাংলা ভাষায় পড়ানো যাবে না, এ প্রশ্ন কিন্তু একদমই অমূলক নয়। যাঁরা বলবেন, বাংলা ভাষায় যথাযথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নেই মেডিক্যাল পড়াশোনার জন্য, তাঁদের বলব বাংলাদেশে কিন্তু গোটা ডাক্তারি পাঠ্যক্রম বাংলাতেই পড়ানো হয়। এবং তার ফলে সেখানে খারাপ মানের ডাক্তার তৈরি হচ্ছে এমনটা কিন্তু বাস্তব নয়। অথচ এইভাবে ভাবার বদলে গোটা দেশ জুড়ে বাধ্যতামূলক ইংরেজি (বা হিন্দির) যে প্রবণতা তৈরি করা হচ্ছে তা চলতি বাজারি কর্পোরেট যুক্তিকাঠামোকেই প্রতিফলিত করে।

সবশেষে বলার, কোন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে NEET-এর বিরোধিতা, তা জানা-বোঝার পাশাপাশি যে ছাত্রছাত্রীরা NEET দেবে, সুযোগ পাবে অথবা পাবে না, তাদেরকেও এই বিশ্লেষণ, বিতর্কের পরিসরে আনতে হবে। বুঝতে ও বোঝাতে হবে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের লাগামছাড়া ফি বৃদ্ধি, ক্যাম্পাসিং-এর বেহাল দশা, উচ্চশিক্ষায় গবেষণাখাতে ফান্ড কমিয়ে দেওয়া, আরও আরও কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিশ্চিত করা (এক কথায় উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রীয়ভবন), বিএড কলেজের আসনের 'দাম' দেড়/দুই লাখ হয়ে যাওয়া, শিক্ষাব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণ, মেডিক্যালে NEET চালু করা, ইঞ্জিনিয়ারিং-এও অভিন্ন প্রবেশিকা চালু করার পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রতিটি আপাতবিচ্ছিন্ন খণ্ডদৃশ্য আসলে কোথাও এক সুতোয় বাঁধা, আসলে একটিই পরিকল্পনার অংশমাত্র। সে পরিকল্পনার খণ্ডবিশেষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে অসম লড়াই শুরু করেছিল অনিতা, সমাজের সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ ছাড়া সেই লড়াইয়ের দিশা পাওয়া অসম্ভব। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. দেবাশিস হালদার, এমবিবিএস, একটি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

Advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

# নিরীহাসুরের "ইমার্জেন্সি" এক্সপিরিয়েন্স

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত

আমার জীবনের প্রথম ইমার্জেন্সি ডিউটির দিনটা আমার আজও মনে আছে। সময়টা দু-হাজার পাঁচের মে জুন হবে। স্থান—কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। তদ্দিনে আমি সদ্য এম বি বি এস পাশ করেছি। শিগগিরই নামের আগে ডা. বসিয়ে লিখব—ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত। ডাক্তার হতে পেরেছি ভেবে হেব্বি কেতা বেড়েছে। কোলগেট টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মতো সর্বদা, গলায় ঝোলে স্টেথো। সেটা, এমনকী চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসেও খুলে রাখি না। হাঁটুতে তালুর ভর দিয়ে, অন্য হাতে চায়ের ভাঁড় তুলে, কেতা মেরে তাকাই চারিপাশে। যতই হোক, ডাক্তার বলে কথা!

তা সে যাগ্‌গে। এইবার আসল কথাটা বলি।

এম বি বি এস পাশ করার পরে, আমাদের বাধ্যতামূলকভাবে একটি বছর খাতায়কলমে (পড়ুন ওয়ার্ডে ওটি-তে) শিক্ষানবিশি করতে হয়। সায়েবরা তার নাম দিয়েছেন—ইন্টার্নশিপ। তো এই ইন্টার্নশিপের দিনগুলোকে রোটেশেনালি বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ করে দেওয়া হত। সার্জারি, গাইনি, পেডিয়াট্রিকস, মেডিসিন ইত্যাদি ইত্যাদি। তারই মাঝে মাঝে চলত—ইমার্জেন্সি ডিউটি বা 'ই আর'।

শুরু হল হাস্যকর এক পরিস্থিতি। আমি যতবারই জেলি মাখিয়ে নল নাকে ঢোকাতে যাই, ততবারই সেই নল পেটে না গিয়ে, রোগীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। আমি ঘেমে-নেয়ে একশা। তার সঙ্গে সঙ্গে চলছে, সৌগতের ধারাবিবরণী . . .

এই 'ই আর' হল এক বিচিত্র জায়গা। জরুরি রোগী এবং চিকিৎসা পরিষেবার এটি হল প্রথম মুলাকাত স্থল। এখানে আমাদের বিচিত্র এবং বিবিধ রোগীকে দেখতে তো হয়-ই, তার সঙ্গে সঙ্গে ফাউ হিসাবে মেলে—

"সদা ক্যালাও পেশেন্ট পার্টি",

"সদা চমকাও রাজনৈতিক নেতা",

"সদা চিল্লাও রাস্তার পাগল"।

এরই মাঝে মাঝে অবশ্য, কখনো-সখনো, হাসনুহানার সুবাসের মতো, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে যান কোনো পীড়িত বাবা অথবা খুশি ডগমগ সন্তান।

যাক, যাক, কাব্যি অনেক হল। কনটেন্টে আসা যাক।

রোটেশন হিসাবে আমার রুমমেট কাম জিগরি দোস্ত সৌগত, থুড়ি, ডা. সৌগত ব্যানার্জির 'ই আর' ডিউটি, আমার এক সপ্তাহ আগে পড়েছিল। সেই হিসাবে, ও হল আমার 'ই আর'-তুতো সিনিয়ার। নির্দিষ্ট দিনে, দুরুদুরু বক্ষে, প্রবেশ করলাম, মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সিতে। রাত তখন ন-টা। উলটো দিকেই ঝকঝক করছে, হেরিটেজ মেডিসিন ওয়ার্ড, যার সিঁড়ি বেয়ে সপ্তপদীতে তরতরিয়ে নেমে এসেছিলেন উত্তমকুমার।

'ই আর'-এ ঢুকে দেখি, থিক থিক করছে ভিড়। ক্রমাগত ট্রলি চেপে কাতরাতে কাতরাতে পেশেন্ট আসছে। সঙ্গে ছুটছে চিন্তান্বিত পেশেন্ট পার্টির দল। ঠিক সামনের ট্রলিটাতে দেখলাম একটা বছর কুড়ির ছেলে চোখ-ফোক উলটে পড়ে আছে। জামাতে ভর্তি বমি। পার্টি বলল বিষ খেয়েছে। আর তক্ষুনি—

আমি সদ্য এম বি বি এস পাশ করেছি। শিগগিরই নামের আগে ডা. বসিয়ে লিখব—ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত। ডাক্তার হতে পেরেছি ভেবে হেব্বি কেতা বেড়েছে। কোলগেট টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মতো সর্বদা, গলায় ঝোলে স্টেথো। সেটা, এমনকী চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসেও খুলে রাখি না।

ঠিক ত-খ-ন-ই বুঝলাম—

বই পড়া বিদ্যে, আর চিকিৎসা করার মধ্যে আসমান-জমিন তফাত। আমার মুহূর্তে সব গুলিয়ে গেল। কী করব, কী ওষুধ দেব, সব ঘেঁটেঘুঁটে একাকার। চোখের সামনে খালি দেখতে পাচ্ছি, বমিতে মাখা একটা শরীরের কাঁধ ধরে, এক রোরুদ্যমানা মাতা, হতাশ চোখে তাকিয়ে আছে।

সৌভাগ্যক্রমে, আমাকে হ্যান্ডওভার দিচ্ছিল সৌগত। ও ততদিনে এসবে বেশ দড়। মুহূর্তে নাকে টিউব গুঁজে স্টমাক ওয়াশ দিয়ে দিল। ইঞ্জেকশন দিল ফটাফট। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—"দেখে নে, কীভাবে রাইলস টিউব পরায়।" তারপর রোগীটিকে ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিল। মা চলে গেল পেছন পেছন কাঁদতে কাঁদতে।

এর পরের রোগীটিই আমার জীবনের প্রথম ইমার্জেন্সি পেশেন্ট। এটিও বিষখোর। তবে অল্প খেয়েছে এই যা। ট্রলির উপর বছর আঠেরোর একটা ছেলে। সারা গায়ে উলকি। চোখ বুজে পড়ে আছে। সৌগত বলল ফিসফিস করে—"মালটা বেশি বিষ খায়নি, ওই দ্যাখ

চোখ পিটপিট করছে। ভড়কি দিচ্ছে বাপ-মা কে। নে, এবার তুই টিউব পরা।"

তারপর শুরু হল হাস্যকর এক পরিস্থিতি। আমি যতবারই জেলি মাখিয়ে নল নাকে ঢোকাতে যাই, ততবারই সেই নল পেটে না গিয়ে, রোগীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। আমি ঘেমে-নেয়ে একশা। তার সঙ্গে সঙ্গে চলছে, সৌগতের ধারাবিবরণী—

"আহ্ হাঃ, আরে-এ-এ-এ এইরকম নয় . . . হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো হচ্ছে . . . ঠ্যাল ঠ্যাল . . . উফ্‌ফ! জলদি ঠেলবি তো . . . আ-হা-হাঃ!"

আমাদের আশেপাশে ভিড় জমে গেছে। সবাই জমিয়ে রগড় দেখছে। আমি নল গুঁতোচ্ছি আর সৌগত "ঠ্যাল ঠ্যাল গোঁজ গোঁজ" করছে . . .

হঠাৎ, সবাইকে চমকে দিয়ে, চোখ বুজে কেলটে পড়ে থাকা রুগী, ধড়মড় করে উঠে বসে বলল—"স্যার প্লিজ, আমি ভালো আছি, প্লিজ . . . নল পরাতে হলে আপনিই পরান স্যার, এই ডাক্তারটা কিচ্ছু জানে না।"

ব্যস! আর কী!

কেস ডিসমিস।

* * * * *

এরপর আস্তে আস্তে, একটু একটু করে আমি শিখেছিলাম, কী করে চরম পরিস্থিতিতেও মাথা ঠান্ডা রেখে, রোগীর চিকিৎসা করতে হয়। কী করে লগুড়-উদ্যত পেশেন্ট পার্টিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করতে হয়। কী করে, সমস্ত অনুভূতিকে ধামাচাপা দিয়ে, রাস্তার পড়ে থাকা ভিখারির ক্ষতস্থান থেকে একটা একটা করে বেছে বেছে তুলে আনতে হয়—সাদা কিলবিল পোকা।

এরপর আস্তে আস্তে, একটু একটু করে আমি শিখেছিলাম, কী করে চরম পরিস্থিতিতেও মাথা ঠান্ডা রেখে, রোগীর চিকিৎসা করতে হয়। কী করে লগুড়-উদ্যত পেশেন্ট পার্টিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করতে হয়। কী করে, সমস্ত অনুভূতিকে ধামাচাপা দিয়ে . . .

দুটো ঘটনার কথা বলে, এই বকওয়াস চচ্চড়ি খতম করব। তারপর বিজয়াতে ফুচকা খেতে বেরোতে হবে। একদিন রাত, 'ই আর'-এ, বসে আছি। ভোরের দিকটাতে পেশেন্টের চাপ সামান্য কম। আমার কো-ইন্টার্ন টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে । তখনও এই হেডলাইনের ভয় ছিল না যে—"ডাক্তাররাও ঘুমোয়!" একটু আগে পালা করে, উলটোদিকের ফুটপাতে চা আর ডিম পাঁউরুটি খেয়ে এসেছি। সেই রাত সাড়ে আটটায় আধসেদ্ধ ভাত আর ওয়াক-থু ডিমের ঝোল খেয়ে বেরিয়েছি। থাকতে হবে সকাল আটটা পর্যন্ত। মাঝখানের এই চা-পাঁউরুটিটুকুই সম্বল। হঠাৎ দেখি একটা পেশেন্ট ঢুকছে তলপেট চেপে। পঞ্চাশ ষাট বয়স হবে। সঙ্গে আরেকটি স্ত্রীলোক। খুব সম্ভবত বউ। ততদিনে, বিধান রায়ের মতো হাওয়া শুঁকে রোগ নির্ণয় করতে না পারলেও, লক্ষণ দেখে রোগ চিনতে শিখেছি। বুড়োর হাঁটা এবং তলপেট চেপে 'টিপিক্যাল' ঝুঁকে থাকা দেখে বুঝেছি—পেচ্ছাপ আটকে গেছে। আসুরিক পরিভাষায় যাকে বলে—"অ্যাকিউট রিটেনশন অফ ইউরিন।"

জিগ্গেস করে বুঝলাম, বাপ-মায়ের কষ্ট করে আমাকে ডাক্তার বানানোটা চারা আনা সফল।

বুড়ো রুগিকে ট্রলিতে শুইয়ে, মূত্রনালীতে ক্যাথিটার পরাতে যাব, দেখি, ছোট্ট একটা "ইউরিনারি স্টোন" আটকে আছে, লিঙ্গের মুখের কাছে। অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। বুড়ো এদিকে ছটফট ছটফট করেই যাচ্ছে। গত আট-দশ ঘণ্টা এক ফোঁটা পেচ্ছাপ করতে পারেনি। পেট ফুলে ঢোল।

হাত ধুয়ে, বেরিয়ে আসছি যখন, ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হয়েছে। শুনতে পেলাম তুমুল চিৎকার—"এরা ডাক্তার! নাকি জানোয়ার? . . . সিস্টার দিদি আর আমি, চোখাচোখি করে একটু হাসলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম নতুন উদ্যমে, রুগী দেখতে।

আমি চান্স নিলাম একটা।

ইমার্জেন্সি ট্রে থেকে, একটা ছোট্ট ধারবিহীন ফরশেপ (আর্টারি ফরশেপ) তুলে, আলতো করে চেষ্টা করলাম, পাথরটা যদি বের করে আনা যায়। ওটাই তো অবস্ট্রাকশন আপাতত। মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সির কোনার দিকটা একটু অন্ধকার আর ফাঁকা ফাঁকা থাকত। লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়াতে ওইখানটাই বেছে নিলাম। পার্টিকে বললাম, টর্চ মারো। আলো ফোকাস করে ধরল মহিলাটি, আর আমি নীচু হয়ে, খুব সাবধানে কাজ শুরু করলাম। মাথায় ঘুরছে তুষার স্যারের, "urethra is delicate darling, বেশি খোঁচাখুঁচি করেছো, তো গ্যালো চিরতরে।"

একটু একটু একটু করে পাথরটা বেরুচ্ছে। ভালো করে চেপে ধরতে পারছি না, ফরশেপ থেকে ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছে, আমার মাথা থেকে কপাল হয়ে চোখে গড়িয়ে নেমে আসছে ঘাম, হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুছছি, আর, সবকিছু আউট অফ ফোকাস হয়ে, শুধু ওই পাথরখানা আমার কাছে "মাছের চোখ" হয়ে আছে।

হঠাৎ, এক ঝটকায়, আমার চোখ মুখ ভেসে গেল জলে। তাকিয়ে দেখি, পাথরখানি আর্টারি ফরশেপে বেরিয়ে আমার হাতে, আর বুড়ো প্রাণ খুলে, পরম শান্তিতে পেচ্ছাপ করছে। সেই পেচ্ছাপের গতিতে

ভিজে যাচ্ছে আমার মুখ। অথচ, আমার একটুও খারাপ লাগার অনুভূতি নেই তখন।

প্রাণ মন জুড়ে শুধু শুনতে পাচ্ছি, বুড়োর—

"আহ্ . . . আপনি . . . আহ্ . . . ভগবান গো . . . আপনি ভগবান।"

বুড়ি শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে, আর আমার তখন মনে হচ্ছে—আমি ধন্য হলাম।

আমি ধন্য হলাম—অসুর জন্ম নিয়ে।

* * * * *

এর বছর খানিক পরের কথা।

আমি তখন সার্জারির সিনিয়ার হাউসস্টাফ। আমার পিজিটি (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি) অখিলেশ আগরওয়াল দাদা একদিন দুপুর তিনটে নাগাদ আমাকে ডেকে বলল—

"সব্বো, একবার মেডিসিন ওয়ার্ড মে যাও তো, কলবুক দেখকে আও।"

কলবুকে ডেট টাইম দিয়ে সই করে, গেলাম "মেল মেডিসিনে"। ওটা হল পুরুষ রোগীদের ওয়ার্ড। সিস্টার পেশেন্ট দেখিয়ে দিলেন। এক অশীতিপর বৃদ্ধ চোখ-মুখ কুঁচকে কোঁত পাড়ছে। পায়খানা পাচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে না। হচ্ছে না তো, হচ্ছেই না সারাদিন ধরে।

পেট দেখলাম, নরম। অবস্ট্রাকশন বা নাড়ি আটকে যাওয়ার ভয় নেই তাহলে!

সিস্টারের কাছে গ্লাভস চাইলাম। গ্লাভস মাঝেমাঝেই অপ্রতুল হত। টানাটানি চলত। মিলত ফুটো হওয়া বাজে কোয়ালিটির গ্লাভস। এ যাত্রায়ও একপাটি মাত্র গ্লাভস মিলল। ডান হাতে সেইটে পরে, একটু ল্যুব্রিকেট করে, খালি বাঁ হাতে, পেশেন্টের কাপড় সরিয়ে, মলদ্বারে দক্ষিণ তর্জনি ঢোকালাম। অনুভব করলাম, অল্প একটু ভিতরেই গুটলি গুটলি স্টুল। কড়া হয়ে, শক্ত হয়ে, আটকে গ্যাছে পরপর। আমি, একটু একটু করে আঙুল দিয়ে বের করতে থাকলাম সেই হাগু। আর খানিক পর, তাৎক্ষণিক অবস্ট্রাকশন কেটে যাওয়াতে, হড় হড় করে আমার গ্লাভস ছাপিয়ে, বাহু পর্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেল পায়খানায়।

বৃদ্ধ প্রাণ খুলে, হাসিমুখে পায়খানা করছেন।

হাত ধুয়ে, বেরিয়ে আসছি যখন, ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হয়েছে। শুনতে পেলাম তুমুল চিৎকার—"এরা ডাক্তার! নাকি জানোয়ার? বাবাকে একটা বেডপ্যান অব্দি দিতে পারে না? সিস্টারগুলো পর্যন্ত, এক-একটা ফালতু মেয়েছেলে . . ."। সিস্টার দিদি আর আমি, চোখাচোখি করে একটু হাসলাম।

তারপর বেরিয়ে পড়লাম নতুন উদ্যমে, রুগী দেখতে।

* * * * *

ডেবরাতে ডাক্তারের গায়ে পায়খানা মাখাবার ঘটনা শুনে, আজকাল আমার বড়ো হাসি পায়।

অসহায় মন খারাপ করা হাসি।

বিষ্ঠা তো মেখে আছি আমরা স্বেচ্ছায় সেই-ই কবে থেকে।

তারপর আরও মাখাবেন?

মাখান।

এ বিষ্ঠা লেপন আসলে নিজের পিতার মুখে পেচ্ছাপ করার শামিল।

অনেক সেন্টু মারলাম।

এবার আসি।

ফুচকা খেতে যাব। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

* * * * *

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত উত্তরবঙ্গে কোনো এক সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। এ-বছর দুর্গাপূজোর ঠিক আগেই ডেবরা-তে এক ডাক্তারের গায়ে বিষ্ঠা মাখিয়ে দেয় 'জনগণ'। সে প্রসঙ্গ টেনে সব্যসাচীর বিজয়া দশমীতে এই লেখা অনেকেরই সোশ্যাল মিডিয়ায় পড়া হয়ে গেছে। যাঁদের পড়া হয়নি, তাঁদের জন্য *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাতায় আরেকবার প্রকাশ পেল সব্যসাচীর লেখাটি।

Advt.

সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্ভব?

কেন্দ্র সরকারের কমিটি বলছে

সম্ভব

সরকার বলছে

অসম্ভব

আমরা বলছি

**সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই।**

আপনি?

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' প্রচার কমিটি

# চাই সবার জন্য স্বাস্থ্য

**ডা. কাঞ্চন মুখার্জি**

গত তিন দশকে ভারতের উন্নতি দেখে যদি কারও চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে থাকে তবে সাবধানে থাকুন। আগামী দু-দশকের উন্নয়নে চোখ ঝলসে যেতে পারে। এমনটাই দাবি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মহলের। উল্কার গতিতে বাড়ছে বাজার। বল্গাহীন আমাদের আত্মপ্রচার। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারে আমাদের টেক্কা দেয় কার সাহস! "সবকা সাথ সবকা বিকাশ"-এর ঝাঁঝালো বিজ্ঞাপনে আমরা সদা প্রজ্বলিত। তবু আপামর নাগরিকের স্বাস্থ্য এই বিকাশের অন্তর্ভুক্ত নয় কেন জানা নেই। একটু পিছনে তাকালেই দেখা যায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৭৮ সালে কাজাখস্থানের আলমা আটায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ২০০০ সনের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্যের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ ছিল অন্যতম। ইতিমধ্যে অনেকবার সরকার বদল হলেও কেউই এখনও পর্যন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। "সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই" দাবিটা করলেই কিছু সুবিধাভোগী মানুষ কেমন একটা অবাক চোখে তাকান। হয়তো ভাবেন এ কোন অতি-বিপ্লবীর অদ্ভুত রোমান্টিক আবদার। তবে এটুকু বলা যায় যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী পৃথিবীর সমস্ত দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সর্বজনীনই হওয়া উচিত।

## ইউনিভার্সাল হেল্থ কেয়ার বা সর্বজনীন স্বাস্থ্য কী?

এটি হল এমন এক সুসংহত ব্যবস্থা যা সমস্ত নাগরিককে বিনা মূল্যে, বৈষম্যহীনভাবে ও ক্রয়ক্ষমতা-নির্বিশেষে সর্বপ্রকার চিকিৎসা প্রদান করা এবং এই পরিষেবা পেতে গিয়ে নাগরিক যেন কোনো আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে না পড়েন তা-ও নিশ্চিত করা। আয়ের স্তর, সামাজিক অবস্থান, লিঙ্গ, জাতি বা ধর্ম নির্বিশেষে দেশের যেকোনো অংশে বসবাসকারী সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের জন্য যথাযথ খরচের, দায়বদ্ধতাযুক্ত, সঠিক, নিশ্চিত গুণমানের সামগ্রিক স্বাস্থ্য-পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই এর লক্ষ্য। সরকার এইসব পরিষেবার ব্যবস্থা করেন এবং নিশ্চিত করেন, যদিও সরকারই একমাত্র পরিষেবাপ্রদানকারী হবেন এমনটা নয়।

## সর্বজনীন স্বাস্থ্য কোন দেশে আছে?

সর্বজনীন স্বাস্থ্য কিছু দেশে প্রায় শতাব্দী প্রাচীন ব্যবস্থা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্মানির তৎকালীন চ্যান্সেলর বিসমার্ক সে দেশে সবার জন্য স্বাস্থ্যবিমা চালু করেন। উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে সন্তুষ্ট রাখা। ক্রমে সবার জন্য স্বাস্থ্যবিমার ধারণা প্রসারিত হয় সবার জন্য স্বাস্থ্যে। ফলস্বরূপ তাঁরা পেয়েছেন একটি সুস্থ, সুবিশাল শ্রমবাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ইউরোপের সমস্ত দেশে সাম্যবাদী ও সমাজবাদী ভাবধারা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আম-নাগরিকের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্যে পরিণত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংল্যান্ড যখন দেশীয় পরিকাঠামো পুনর্গঠন করতে

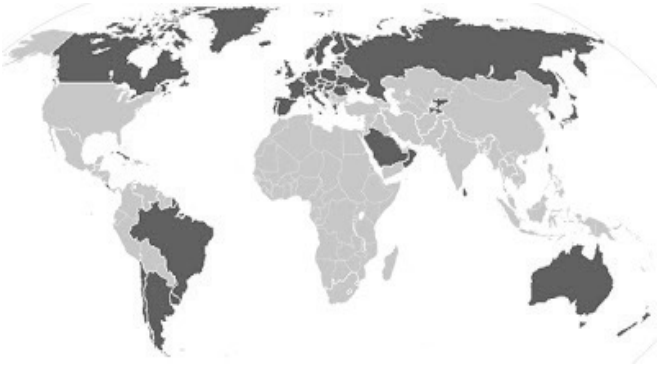

চিত্র ১. উপরে বিশ্বের মানচিত্রে গাঢ় রঙের দেশগুলিতে সর্বজনীন স্বাস্থ্য বিদ্যমান

চেয়েছে, সেই প্রেক্ষপটে বেভারিজ (Beveridge) কমিশনের রিপোর্টকে মান্যতা দিয়ে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অ্যানাউরিন বেভান (Aneurin Bevan) জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার (National Health Service) সূচনা করেন। একে একে সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, স্লোভেনিয়া, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, পোর্তুগাল, সাইপ্রাস, গ্রিস, স্পেন, আইসল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ডেও সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু হয়। এশিয়া মহাদেশে প্রথম সর্বজনীন স্বাস্থ্য শুরু হয় চীনে ১৯৫১ সালে। তারপর আস্তে আস্তে সেই তালিকায় যোগদান করে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ইজরায়েল, তাইওয়ান ও থাইল্যান্ড। সারা পৃথিবীর আরও অনেক দেশ পেরেছে। প্রায় সমগ্র ইউরোপ পেরেছে। এমনকী গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত ছোট্ট দেশ শ্রীলঙ্কাও পেরেছে। আমরা পারিনি। পারার কোনো চেষ্টাও করিনি।

## ভারতবর্ষে সর্বজনীন স্বাস্থ্য-র কথা কি নতুন?

ভারতবর্ষে কিন্তু সবার জন্য স্বাস্থ্য কোনো নতুন প্রসঙ্গ নয়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে (১৯৪৬) সবার জন্য স্বাস্থ্যের স্বপ্ন প্রথম দেখানো হয় ভোর (Bhore) কমিটির সুপারিশে যেখানে নাগরিকের ক্রয় ক্ষমতা ব্যতিরেকে সকল প্রকারের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বিতরণের কথা বলা হয়েছিল। বিগত কয়েক দশকে দফায় দফায় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণীত ও পরিমার্জিত হয়েছে। আমদের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে কখনো 'গ্রামীণ' স্বাস্থ্যে, কখনো 'প্রাথমিক' পর্যায়ে আবার কখনো বা 'প্রয়োজনীয়' নামের আড়ালে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমরা সবার

জন্য স্বাস্থ্যের পরিকল্পনা নিতে পারিনি। ২০১০ সালে যোজনা কমিশন একটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেন। যার নেতৃত্বে ছিলেন অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক কে শ্রীনাথ রেড্ডি। পরের বছরেই এই কমিশনের রিপোর্ট মেলে। বলা হয় স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপির ১.৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০১৭ সালের মধ্যে ২.৫ শতাংশ এবং ২০২২ সালের মধ্যে ৩ শতাংশ করা হোক। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একটি করে "ইন্ডিয়া হেল্‌থ কার্ড" হোক যা দেখিয়ে সে অত্যাবশ্যক, প্রাথমিক, মধ্যস্তরীয় ও সর্বোচ্চস্তরের চিকিৎসা বিনামূল্যে পাবে। বলাই বাহুল্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত সুপারিশ কার্যকরী করার বিশেষ আগ্রহ দেখাননি এবং বর্তমান সরকারও তার ব্যতিক্রম নন। ২০১২

সালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এর স্থান হয়নি। তারপর তো যোজনা কমিশনই বিলুপ্ত। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১৭ অবশ্য স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় ১.৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২.৫ শতাংশ করতে বলেছে যদিও 'নীতি আয়োগ' তাদের সঙ্গে একমত নন এবং পরিবর্তে জেলা স্তরের হাসপাতালগুলিকে কীভাবে ৩০ বছরের জন্য বেসরকারি লীজ বা ইজারায় দেওয়া যায় তার বন্দোবস্ত করছেন।

## স্বাস্থ্যের জন্য যে যার পকেট থেকে দিলে কী ক্ষতি?

দীর্ঘদিন ধরে আমাদের স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ জিডিপির এক শতাংশের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করেছে। শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশন যে সামান্য বর্ধিত হারে ব্যয়বরাদ্দ সুপারিশ করেছিল সে প্রস্তাব মানা হয়নি। ২০১৪-য় নতুন সরকার আসার পর সমাজকল্যাণমূলক খাতে ব্যয়বরাদ্দ অনেক ক্ষেত্রেই কমেছে, স্বাস্থ্যও ছাড় পায়নি। তবে শেয়ার বাজারে সেনসেক্স বেড়েছে। ধনী দরিদ্রের ব্যবধান বেড়েছে। সরকারি বরাদ্দ কম থাকার ফলে চিকিৎসাজনিত খরচের প্রতি একশো টাকার মধ্যে তেষট্টি টাকা খরচ করতে হয় মানুষকে নিজের পকেট থেকে, যাকে বলা হয় "আউট অফ পকেট" এক্সপেন্স। পাহাড়প্রমাণ চিকিৎসা-ব্যয় সামলাতে গিয়ে ভারতবর্ষে প্রতি বছর ছয় কোটিরও বেশি মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যাচ্ছেন। আমাদের দেশে গত কয়েক বছরে গরিব মানুষের জন্য একেবারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি তা নয়। RSBY প্রকল্পের মাধ্যমে বি পি এল শ্রেণিভুক্ত মানুষদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা বিশেষ প্রচলিত। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। প্রতি পরিবারে সর্বাধিক পাঁচ সদস্য পিছু সর্বমোট বরাদ্দ বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র। তাও সেটা হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন খরচ বাবদ। এর বাইরে সমস্ত খরচ পরিবারের নিজস্ব অর্থাৎ সেই আউট-অফ-পকেট এক্সপেন্স। তাছাড়া এই RSBY প্রকল্প একটি দ্বিস্তরীয় ব্যবস্থারও জন্ম দেয়। আইন প্রণয়নকারীরা বা প্রকল্প রূপায়ণকারীরা নিজেরাই যদি সেই ব্যবস্থার প্রতি আস্থা না রাখতে পারেন তাহলে সাধারণ মানুষ কীভাবে ভরসা রাখবেন। বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের জন্য 'ই এস আই' নামক যে স্বাস্থ্যবিমা রয়েছে তা

> অনেকবার সরকার বদল হলেও কেউই এখনও পর্যন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। "সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই" দাবিটা করলেই কিছু সুবিধাভোগী মানুষ কেমন একটা অবাক চোখে তাকান।

কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকর। এই যৌথ-করদ ব্যবস্থায় শ্রমিক ও মালিক দুই পক্ষই বিমার প্রিমিয়াম দিতে থাকেন যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা তার উপর নির্ভরশীল পরিবারবর্গ প্রাথমিক স্তর থেকে অন্তিম স্তর অবধি সব চিকিৎসা বিনা মূল্যে পান। তবে যে দেশে নব্বই শতাংশ মানুষ স্বনিযুক্ত পেশায় বা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন সেখানে 'ই এস আই' যথেষ্ট হতে পারে না।

## এত টাকা কি আমাদের সরকারের আছে?

প্রশ্ন আসতে পারে সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থসংস্থান কীভাবে হবে সে নিয়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ ব্যাপারেও নিশ্চিত দিক নির্দেশ দিয়েছেন। নাগরিকের চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ করই হবে তার মূল উৎস। পারস্পরিক ভরতুকি (cross subsidisation) প্রদানই হল সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। যুক্তরাজ্যে প্রচলিত জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা বা NHS-এর মডেল এক্ষেত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি। এই ব্যবস্থায় যেখানে পরিষেবা পাওয়া যাবে সেখানে কোনো খরচ হবে না (Free at the point of delivery)। চুলচেরা বিচার করলে হয়তো কোনো মডেলেই নিখুঁত নয়। তাই বলে কোনো উদ্যোগই নেব না সেটাও হতে পারে না।

## বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা নয় কেন?

মুনাফাভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য আর পরিষেবা থাকে না। তাকে পণ্য হিসাবেই দেখা হয়। তার মানে এই নয় যে সমস্ত বেসরকারি পরিকাঠামো বন্ধ করে দিতে হবে। এই সমস্ত সংস্থার কাছে সরকারই যদি একমাত্র ক্রেতা হন তাহলে এদের মূল্যমানের ওপর সরকারের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থাকবে। শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশনের সুপারিশ এরকমই। "সবার জন্য স্বাস্থ্য" চালু করতে গেলে স্বাস্থ্যকে বাজার অর্থনীতির বাইরে রাখতে হবে।

গরিব মানুষের জন্যে সামাজিক সুরক্ষা গোছের কিছু স্বাস্থ্যবিমা চালু করে আমরা তাদের মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করি। আর ধনীরা নিজস্ব স্বাস্থ্যবিমা কিনে কোনোরকমে হাসপাতালের খরচ সামলান। তবে এর কোনোটিই প্রাথমিক স্তরে রোগ প্রতিরোধে বা হাসপাতাল

নীচের স্তর মানে হল একদম প্রাথমিক করণীয় কাজ-এর স্তর, সবথেকে আগে করার স্তর। ডেঙ্গু হবার পরে তার চিকিৎসা নয়, হবার আগেই মশা আটকানো। এই স্তরে কোনো বেসরকারি হাসপাতাল, কোনো বিমা ব্যবস্থা কাজ করে না, আর সেটাই স্বাভাবিক।

বহির্ভূত খরচ মেটাতে আগ্রহী নয়। শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশন CGHS, ESI, RSBY ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিমা একত্রিত করে একটি অভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের প্রস্তাব দেয় যদিও তা এখনও হিমঘর থেকে বেরিয়ে আলোচনা স্তরেও পৌঁছোতে পারেনি।

## রোগের চিকিৎসা থেকে সামগ্রিক স্বাস্থ্য

সম্পূর্ণ অগোছালো অবস্থা থেকে রাতারাতি ভারতবর্ষে "সবার জন্য স্বাস্থ্য" চালু হয়ে যাবে এরকম দিবাস্বপ্ন কেউ দেখেন না। চিকিৎসা মানে শুধু ডাক্তার-হাসপাতাল-ওষুধ-অপারেশন নয়। স্বাস্থ্য একটি বৃহত্তর প্রয়াস। স্বাস্থ্য মানে পুষ্টি, শিক্ষা, দূষণমুক্ত পরিবেশ, নিরাপদ পানীয় জল, সর্বাঙ্গীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ। রোগের চিকিৎসা জাতীর সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটা নির্ণায়ক মাত্র। অতএব স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে গেলে চাই হোলিস্টিক (সার্বিক) দৃষ্টিভঙ্গি। চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা। জিডিপি বাড়লেই উন্নত দেশ হওয়া যায় না। তুলনামূলকভাবে ভারতের চেয়ে কমজোরি অর্থনীতির উপর ভর করে বিভিন্ন দেশ সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালাতে পারে। আমরা নির্ভর করি ভগ্নপ্রায় সরকারি পরিকাঠামো এবং মূলত পুঁজিবাদী বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোর ওপর।

কোনো দেশের পক্ষেই নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়দায়িত্ব হাতে নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আমেরিকার মতো প্রায়-সর্বশক্তিমান দেশও পারেনি। পূর্বতন রাষ্ট্রপতির ফ্ল্যাগশিপ আইন "অ্যাফর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট ২০১০" যা কিনা ওবামাকেয়ার বলে সমধিক প্রসিদ্ধ তাকেও এখন প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে। ওবামাকেয়ার অবশ্য ওই দেশে "সবার জন্য স্বাস্থ্য" প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যবিমাগুলিকে আরও জনমুখী করতে চেয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিমা কোম্পানিগুলি তাদের দৌরাত্ম্য বাড়াতে উদ্যত। আমাদের দেশেও স্বাস্থ্য পরিষেবার মূল ক্রেতা যদি বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলি হয়, স্বাস্থ্যনীতিও তাঁরাই নির্ধারণ করবেন আর কীভাবে, কোন অছিলায় বিমাকারীকে বঞ্চিত করা যায়, তার ফন্দি আঁটবেন। সহজ কথায়, বেসরকারি স্বাস্থ্যবিমা নির্ভর 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' আসলে বিমা-কোম্পানিগুলোর আর্থিক স্বাস্থ্যই পুষ্ট করবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সাঁট করে বেসরকারি বড়ো হাসপাতালগুলো লুটেপুটে খাবে।

## প্রতিরোধ ব্যবস্থায় জোর

এই মুহূর্তে আমরা যে প্রাথমিক, মধ্য ও সর্বোচ্চ এই ত্রিস্তরীয় পিরামিড মডেল ফলো করি তার একেবারে নীচের স্তরে রাখা উচিত মানুষের স্ব-যত্ন ও সচেতনতা। নীচের স্তর মানে কিন্তু সবথেকে কম প্রয়োজনীয়

সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে স্বাস্থ্য কোনো রাষ্ট্রপ্রদত্ত ভিক্ষা নয়। স্বাস্থ্য মানুষের অধিকার। . . . হাসপাতাল ভাঙচুর করে বা ডাক্তার পিটিয়ে কোনো লাভ নেই। . . . পরিবর্তে সঠিক জায়গায় আওয়াজ তুলতে হবে।

কাজের স্তর নয়, নীচের স্তর মানে হল একদম প্রাথমিক করণীয় কাজ-এর স্তর, সবথেকে আগে করার স্তর। ডেঙ্গু হবার পরে তার চিকিৎসা নয়, হবার আগেই মশা আটকানো। এই স্তরে কোনো বেসরকারি হাসপাতাল, কোনো বিমা ব্যবস্থা কাজ করে না, আর সেটাই স্বাভাবিক। এটা কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা জারি করতে পারলে প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়।

সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে স্বাস্থ্য কোনো রাষ্ট্রপ্রদত্ত ভিক্ষা নয়। স্বাস্থ্য মানুষের অধিকার। চিকিৎসায় সন্তুষ্ট না হলে হাসপাতাল ভাঙচুর করে বা ডাক্তার পিটিয়ে কোনো লাভ নেই। এতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। পরিবর্তে সঠিক জায়গায় আওয়াজ তুলতে হবে। আমজনতার জন্য সরকারি হাসপাতাল আর খাসজনতার জন্য পাঁচতারা ব্যবস্থার কারণ খুঁজতে হবে তাঁদের। উন্নয়নের বক্কাবাজি শুনে বধির হয়ে গেলে চলবে না। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

এই লেখাটির ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ *এই সময়* পত্রিকায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত।

ডা. কাঞ্চন মুখার্জি, এমবিবিএস, এফআরসিওজি, ফিটাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

# চিকিৎসকদের ওপর হামলা

## চিকিৎসকদের বক্তব্য

৩০ অক্টোবর, ২০১৭, কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রে আয়োজিত এক কনভেনশনে কয়েকটি চিকিৎসক-সংগঠন এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

এই সভা গভীর উদ্‌বেগের সঙ্গে লক্ষ করেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আজ এক সংকটের সম্মুখীন—চিকিৎসক-চিকিৎসাকর্মীদের ওপর লাগাতার হামলা। এমন নয় যে, এ ধরনের হামলা আগে ছিল না, কিন্তু বিগত ৮ মাসের মধ্যে প্রায় ৭০ জনের বেশি চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনা আজ একে এক অন্য মাত্রায় উপস্থিত করেছে। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে চিকিৎসাকর্মীদের ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনা আগে খুব একটা ঘটেনি। ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা বেশি নিগৃহীত হয়েছেন। এছাড়া এটা পরিষ্কার যে, যারা হামলাকারী তাদের মধ্যে রোগীর পরিজনের থেকে এলাকার মস্তানরা বেশি সক্রিয়।

দায়িত্বশীল চিকিৎসক সংগঠন হিসাবে অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব এসে যায় এর কারণ নির্ণয়ের। চিকিৎসক-রোগী সম্পর্কের আজ অবনতি ঘটেছে এটা বাস্তব, কিন্তু এই কনভেনশন মনে করে যে এটা সামগ্রিক চিত্র নয়। আজও সারা রাজ্য জুড়ে অসংখ্য দরদি চিকিৎসকদের কাছে আস্থা সহকারে হাজার হাজার রোগী চিকিৎসা করাচ্ছেন। এই সভা মনে করে যে, চিকিৎসক রোগীর সম্পর্ক ভালো না থাকলে তা সম্ভব হত না। সমস্যা মূলত নিহিত রয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে কর্পোরেট ব্যবস্থাকে উৎসাহদানের মধ্যে।

পরিষেবা না পেয়ে দিশাহীন ও অসহায় রোগী পরিজনদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে সামনে উপস্থিত কতিপয় চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের ওপরে। বর্তমানে পরিকাঠামোর অপ্রতুলতার জন্য সরকারি পরিষেবা ভেঙে পড়ছে। রাজ্য সরকার ঘটা করে একের পর এক নতুন পরিষেবা ও মাল্টি/সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল উদ্বোধন করছে প্রয়োজনীয়

**ভবিষ্যতে প্রতিটি হামলার ঘটনায় প্রতিকার চেয়ে চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার এই কনভেনশন ঘোষণা করছে।**

পরিকাঠামো-লোকবল ছাড়াই। সরকারি ক্ষেত্রে সমস্ত চিকিৎসা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে বলে সরকার ঘোষণা করার পর মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে, সরকারি হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু তার অনুপাতে পরিকাঠামো বাড়েনি। এর ফলে বেড়েছে রোগীদের ভোগান্তি। এই সভা মনে করে যে, এই সকল উদ্ভূত অব্যবস্থার জন্য

পরিষেবা না পেয়ে দিশাহীন ও অসহায় রোগী পরিজনদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে সামনে উপস্থিত কতিপয় চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের ওপরে। বর্তমানে পরিকাঠামোর অপ্রতুলতার জন্য সরকারি পরিষেবা ভেঙে পড়ছে।

কোনোভাবেই চিকিৎসক-চিকিৎসাকর্মীরা দায়ী নন।

চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে বিগত দু-দশকে এই রাজ্যে কর্পোরেটদের রমরমা। ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন কর্পোরেটদের একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা—তার প্রতিফলন স্বভাবতই তাদের পরিষেবার ক্ষেত্রে পড়েছে। বেড়েছে লাগামহীন বেনিয়ম। অথচ এর জন্য সেই হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের শিকার হতে হচ্ছে, তার উপর জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১৭-তে ঘোষণা করা হয়েছে যে, দেশের চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বিমা ও প্রাইভেট কর্পোরেট হাসপাতাল মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। একইভাবে ওষুধের দামের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকার জন্য সাধারণ মানুষ চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। চিকিৎসক যেহেতু ওষুধ প্রেসক্রাইব করছেন তাই চিকিৎসককেই মানুষ দায়ী করছেন। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যম স্বভাবতই জনস্বাস্থ্যের পক্ষে নয়।

কয়েক দশক চলা এই নিয়মের লাগাম টানার চেষ্টা কোনো সরকারই করেনি। আচমকা গত ফেব্রুয়ারি মাসে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বেনিয়ম রোখার নাম করে কতিপয় কর্পোরেট-নার্সিং হোম মালিক এবং সমগ্র চিকিৎসক সমাজের ওপর এই দায় চাপিয়ে দেন—এই বক্তব্য সরাসরি বৈদুতিন মাধ্যমে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই কনভেনশন দৃঢ়ভাবে মনে করে হাসপাতালে হামলাবাজির ঘটনা এরপর থেকেই বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা মনে করি, সরকারের ভূমিকাকে আরও প্রসারিত ও উন্নত করে দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্যের অধিকারকে সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত করতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে। এরজন্য প্রয়োজন যৌথ স্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা। পাশাপাশি যাতে চিকিৎসক-চিকিৎসাকর্মীরা সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ভয়ে চিকিৎসা করতে পারেন তার জন্য আশু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এই কনভেনশন দাবি করছে—

**ক. রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালের প্রতিটি হামলার ক্ষেত্রে 'প্রিভেনশন অফ মেডিকেয়ার সার্ভিসেস অ্যান্ড মেডিকেয়ার সার্ভিস প্রফেশনালস (প্রিভেনশন অফ ভায়োলেন্স) অ্যাক্ট ২০০৯' প্রয়োগ করে কঠোর এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। চিকিৎসক-চিকিৎসাকর্মীদের ওপর হামলাবাজদের জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করতে হবে এবং দোষ প্রমাণিত হলে চূড়ান্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।**

**খ. সরকারি হাসপাতাল ও বড়ো হাসপাতালে পুলিশ পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে পুলিশ পোস্টকে কার্যকরী করতে হবে।**

**গ. অবিলম্বে সরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রে IPHS guideline অনুযায়ী পরিকাঠামোগত চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীর শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।**

**ঘ. চিকিৎসক সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করে ওয়েস্টবেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এসটাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট ২০১৭-র প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে।**

বিভিন্ন চিকিৎসিক সংগঠনের ডাকা চিকিৎসকদের এই গণ

সরকারি হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু তার অনুপাতে পরিকাঠামো বাড়েনি। এর ফলে বেড়েছে রোগীদের ভোগান্তি। এই সভা মনে করে যে, এই সকল উদ্ভূত অব্যবস্থার জন্য কোনোভাবেই চিকিৎসক-চিকিৎসাকর্মীরা দায়ী নন।

কনভেনশন আশা করছে যে, রাজ্য সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনবেন ও আপামর চিকিৎসকদের আস্থা অর্জন করবেন। চিকিৎসকদের নির্ভয়ে কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হামলাবাজি প্রতিরোধ করার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভবিষ্যতে প্রতিটি হামলার ঘটনায় প্রতিকার চেয়ে চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার এই কনভেনশন ঘোষণা করছে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম (WBDF), ডক্টরস ফর পেশেন্টস (DOPA), অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস (AHSD), ডক্টরস ফর ডেমোক্র্যাসি (DoFoD), মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার (MSC), সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম (SDF), আইএমএ-র কয়েকটি শাখা ও শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ।